ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বেগম রোকেয়া আনছার

ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বেগম রোকেয়া আনছার

কল্যাণ প্রকাশনী, ঢাকা

প্রকাশকঃ
কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১/৪৫

প্রথম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর '৮৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ '৮৮
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর '৮৯
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর '৯১
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ মে '৯৯
(লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য ঃ সাদা ২২.০০ (বাইশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণেঃ
এস, এস, প্রিন্টার্স
৪৩৫, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

প্রাপ্তিস্থানঃ

১। জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা
২। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা
৩। প্রফেসরস্ বুক কর্ণার, ঢাকা
৪। তাসনিয়া বই বিতান, ঢাকা
৫। সখী বিতান, হেতেম খাঁ, রাজশাহী

ISLAMI ANDOLONE MOHILAKARMIR DAYITTA O KORTABAB
Written by Begum Rokeya Ansar. Published by Kallayan Prokashani 435/A, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217 Phone : 9331581/45
Price : White Tk. **Twenty two** only.

অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারপূর্ণ জাতিকে আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে হলে নবীর এ আন্দোলনে শুধু পুরুষদের যোগদান করলে চলবে না বরং নারী সমাজকে তাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে, সহযোগীতা করতে হবে। এপথ সেদিন একজন নারীতো দূরের কথা একজন পুরুষের জন্যও ছিল দুর্গম। সেই দুর্গম পথ এই মহীয়সী মহিলা গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিনের পর দিন যখন হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁর জন্যে খাদ্য পানীয় জুগিয়েছিলেন হাসি মুখে। অতঃপর প্রথম অহী নাজিলের পর জিবরাইল (আঃ) -কে দেখে নবী (সাঃ) ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে খাদীজা (রাঃ) তাঁকে শান্তনা ও অভয় দিয়েছিলেন।

সহি বুখারী শরীফে এ ঘটনার যে পূর্ণ বিবরণ রয়েছে তা নীচে দেওয়া হ'লোঃ-

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আখেরী নবীর ওপর অহীর সুত্রপাত হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যা স্বপ্নে দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মত সত্যই বাস্তবে ঘটত। অতঃপর তিনি নির্জনবাস শুরু করেন। খাদ্য দ্রব্য ফুরিয়ে গেলে তিনি আবার ফিরে আসতেন খাদীজার (রাঃ) কাছে এবং পুনরায় খাদ্য দ্রব্য নিয়ে ফিরে যেতেন হিরা পর্বতের গুহায়। একদিন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেনঃ "পাঠ করুন! তিনি জবাব দিলেনঃ "আমি লেখা পড়া জানিনা।" ফেরেশতা তাঁকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। জবাবে তিনি বললেন "আমি লেখা পড়া জানিনা।" ফেরেশতা দ্বিতীয়বার তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন– 'পাঠ করুন'। তিনি আগের মতই বললেন– "আমি লেখাপড়া জানিনা।" তৃতীয়বার ঝাকুনী দিয়ে বললেন– 'পড় তোমার প্রভুর নামে', এর পর রাসুল (সাঃ) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে এলেন এবং খাদীজার (রাঃ) কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। খাদীজা (রাঃ) সব শুনে বললেন, আপনি ভীত হবেন না। খোদা আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। কারণ আপনি মৈত্রী স্থাপন করেছেন। অক্ষম ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আশ্রয় দেন এবং কষ্টের মধ্যেও সত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ) রাসূলে করিম (সাঃ) কে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইবনে নওফেল ঈসায়ী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইব্রানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন, সে সময় তিনি দৃষ্টি শক্তিরহিত ও বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচার পুত্র, আপনার ভাই এর পুত্রের কথা শুনুন। তিনি বললেন, হে আমার ভাই-এর পুত্র, তুমি কি দেখেছ? রাসূলে করীম (সাঃ) ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলে ওরাকা বললেন, মুসার (আঃ) ওপর

পারেনি। যার জন্যে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অসহ্য নির্যাতন। এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে। কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করেননি।

বিবি হাজেরাঃ বিবি হাজেরা হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) সুযোগ্যা সহধর্মিনী। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে তিনি সাহায্য করেছেন নিষ্ঠার সাথে। আল্লাহ এবং নবীর প্রতি ঈমানের এক বলিষ্ঠ উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন তিনি। আল্লাহর নির্দেশে জনমানবহীন মরু প্রান্তরে শিশু পুত্র ইসমাইল (আঃ) সহ বিবি হাজেরাকে রেখে আসলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। তিনি যখন ফিরছিলেন তখন হাজেরা স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আল্লাহর নির্দেশে আমাদের রেখে যাচ্ছেন? উত্তরে ইব্রাহিম (আঃ) বললেন–হাঁ। তখন বিবি হাজেরা শান্তনা পেলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্যে আনন্দ অনুভব করলেন। শিশুপুত্র যখন ধীরে ধীরে বড় হলো, তখন আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে কোরবাণীর জন্যে যখন নিয়ে গেলেন তখনও বিবি হাজেরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে স্বামী ও পুত্রকে সাহায্য করলেন হাসি মুখে। পুত্রকে কোরবানী করা হবে এ জেনেও মার চুপ করে থাকা খুব সহজ কথা নয়। এটা পারে শুধু সেই মা যার আল্লাহর ওপরে আছে দৃঢ় বিশ্বাস। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এমন একজন বলিষ্ঠ ঈমানদার স্ত্রীকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলে। এ রকম ঈমানদার মায়ের সন্তান হওয়ার কারণেই হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ পালনে হাসতে হাসতে যেতে পেরেছিলেন। আজও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে স্বামীর সক্রিয় সহযোগী এবং পুত্রকে উৎসর্গ করে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে প্রেরণা যোগাতে পারে বিবি হাজেরা।

হযরত খাদীজা (রাঃ)ঃ হযরত খাদীজা (রাঃ) তৎকালে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠা ধনী মহিলা ছিলেন। তাঁর বংশের ধারা চার পুরুষ আগে রাসূলের (সাঃ) বংশের সাথে এসে মিলিত হয়। খাদীজার পিতার নাম ছিল খাওলেদ বিন আসাদ বিন আব্দুল আরবী বিন কুসাই। মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিন্‌তে যায়েদা। হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী। রাসূল এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কর্মী এবং প্রথম মুসলমান। হেরা পর্বতের গুহায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের সন্ধান লাভ করেন সে দিনই তিনি তাঁকে বিনা দ্বিধায় আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নেন। সারা আরব যখন কুসংস্কার আর অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন একজন নারীর পক্ষে সত্যকে চিনতে পারা তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশুদ্ধ চিন্তারই পরিচয় বহন করে। খাদীজা (রাঃ) খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনে মহিলাদের অবদান

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি আন্দোলন করা প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্যে ফরজ। যুগে যুগে যে ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কোন অংশেই গৌণ ছিল না। বরং তারা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন।

দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন চলছে ও চলবে। সে আন্দোলনে ঈমানের তাগিদেই মহিলাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। আর আজকের ইসলামী আন্দোলনের কাজে মহিলাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি হতে পারে অতীত যুগের ইসলামী আন্দোলনে মহিলাদের অবদান স্মরণ করলে। তাই অতীত যুগের কয়েকজন সংগ্রামী মহিলার জীবনী উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলাম।

বিবি আছিয়া ঃ বিবি আছিয়া ছিলেন মিশরের কাফের বাদশাহ ফেরাউনের স্ত্রী। সে যুগের দুর্দান্ত প্রতাপশালী বাদশাহ ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। ফেরাউনের মনগড়া মতবাদ উৎখাত করে ইসলামী সমাজ তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহ্ পাক নবী করে পাঠালেন হযরত মূসা (আঃ) কে। ফেরাউনকেও মূসা (আঃ) তার বাতিল মতবাদ পরিত্যাগ করার জন্যে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে তা শুনলো না। বরং সে মূসা (আঃ) এর বিরোধিতা করল এবং তাঁকে নির্যাতিত করলো। কিন্তু বিবি আছিয়া আল্লাহর রহমতে এবং তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কারণে হক ও বাতিলের পথ চিনতে পারলেন, তাই তিনি ঈমান আনলেন আল্লাহর ওপর-মূসা (আঃ) আনীত দ্বীনের ওপর। আর অস্বীকার করলেন স্বামীর দেয়া মনগড়া মতবাদকে। স্বামীর ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিবি আছিয়া হলেন মূসা(আঃ) এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগ্রামী কর্মী। একজন জালেম বাদশার ঘর থেকে তার বিরোধীতা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। ইসলামী আন্দোলনের পথে চললে তাঁর প্রতি আসবে অসীম নির্যাতন, দুঃখ-যন্ত্রণা, তা তিনি জানতেন, জালেম বাদশা ফেরাউন তাঁর সন্তানদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মারলো, তারপরও সত্য পথ থেকে তাকে একচুলও টলাতে পারলো না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ পথেই রয়েছে পরকালীন মুক্তি। দুনিয়ার কোন সুখ শান্তি তাঁকে সত্য পথ থেকে সরাতে

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ।"

কোরআন হাদীসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর দ্বীনকে জানা, তা মানা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করা শুধু পুরুষের জন্যে ফরজ নয়, নারীদের জন্যেও ফরজ। দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি পেতে হলে এবং জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পেতে হলে, পুরুষকে যেমন চেষ্টা করতে হবে, তেমনি চেষ্টা করতে হবে নারীকেও।

ইসলাম নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। তাকে পুরুষের পরিপূরক অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি। তাই পুরুষরা যেভাবে চালাবে নারীরা সেভাবে চলবে এটা ঠিক নয়। ঈমানও ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও তা আন্তরিকার সাথে মেনে চলার দিক দিয়ে প্রত্যেকটি পুরুষকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তেমনি প্রত্যেকটি নারীকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। নারী পুরুষ প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজের জন্য পাবে তার কর্মফল। একজন নারীকে যেমন একজন পুরুষের কর্মফলের ভাগ দেয়া হবে না। তেমনি একজন পুরুষকেও একজন নারীর কর্মফলের ভাগ দেয়া হবে না। কোন নারীই শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলে রেহাই পাবে না যে আমার স্বামী ইসলামী আন্দোলনের একজন বড় নেতা ছিলেন বা একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। একথা বলেও রেহাই পাবেনা যে আমার স্বামী আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে চলতে বলেন নি, অথবা আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে চলতে বাধা দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন যেমন একজন পুরুষের জন্যে অপরিহার্য তেমনি একজন নারীর জন্যেও। পৃথিবীতে নিজের ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যেই আমাকে ন্যায় ও সত্যের পথে এ কাজ করতে হবে। এ কাজে যদি বাধাও আসে তবুও নারী বলে আমি বসে থাকতে পারবো না। এটাই ঈমানের দাবী। আর এর উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন বিবি আছিয়া। তিনি ছিলেন কাফের বাদশা ফেরাউনের স্ত্রী। কিন্তু তিনি স্বামীর মনগড়া মতবাদে বিশ্বাসী না হয়ে ঈমান আনলেন আল্লাহর ওপরে এবং তাঁর প্রেরিত নবী হযরত মূসার (আঃ) ওপর। দারুণ বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের পথে সংগ্রাম করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন করা যে নারী পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব তা কোরআন হাদীস থেকেও প্রমাণিত। আল্লাহ পাক সূরা তওবার৭১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۔

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পর বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাজিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"

সূরা নেসার ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশী দিয়েছেন তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে। আর যা কিছু স্ত্রী লোকেরা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে কাজ করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।"

মোজাহিদ যখন থেকে জিহাদের জন্যে যাত্রা শুরু করলো তখন থেকে (বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত) তুমি মসজিদে থেকে সর্বদা নামাজে লিপ্ত থাক, মুহূর্তের জন্যেও খান্ত হওনা, রোজা রাখতে থাক রোজা না ভাঙ্গ- এ রকম করতে পারবে কি? ঐ লোক আরজ করলো কে এমন আছে যে এরকম করতে পারে।"

আমাদের মধ্যে জেহাদ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে। মনে করা হয় যুদ্ধ মানেই জেহাদ। কিন্তু আসলে তা নয়। যুদ্ধ জেহাদের একটা অংশ মাত্র।

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চরম প্রচেষ্টা। আর পারিভাষিক অর্থ হল আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, তার জন্যে মরণ পণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় শক্তিকে এতদ্দুশ্যে নিয়োজিত করা।

জিহাদ শুধু সশস্ত্র অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং লিখন ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারা বদলিয়ে তাকে আল্লাহর দ্বীনের অনুগামী করাও জিহাদ। আবার দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাও জিহাদ। চরম অবস্থায় শক্তি প্রয়োগ করে বাতিল ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে খোদায়ী ব্যবস্থা কায়েম করার নামও জিহাদ।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ কি শুধু পুরুষদের?

ইতোপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ সকল মানুষের জন্য ফরজ। কিন্তু এ কাজ কি শুধু পুরুষের জন্যে?। এখানে নারীদের কিছুই করণীয় নেই? অবশ্যই আছে। আমরা জানি ইসলাম মানব জীবনের জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধান যেমন পৃথক পৃথক ভাবে একজন মানুষের ব্যক্তিগত বিধান, তেমনি সকল মানুষের মিলিত সমাজ জীবনের জন্যেও বটে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক জীবনে পূর্ণতা নারীকে বাদ দিয়ে কখনও সম্ভব নয়। নারী সমাজের একটা গুরুত্বপূণ অংশ। সমাজের সংশোধন সংক্রান্ত কোন আন্দোলনই নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। যেহেতু ইসলামী আন্দোলন মানুষের গোটা জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাই নারীকে বাদ দিয়ে এ আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করার কল্পনাও করা যায় না। তারপর আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ হবার, তাঁর কাছে জবাবদিহি করার এবং নিজ নিজ কাজের প্রতিফল পাবার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর আদেশ মেনে চলা যেমন একজন পুরুষের জন্যে ফরজ তেমনি একজন নারীর জন্যেও ফরজ অবশ্য করণীয়।

আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলব না যা তোমাদের দোজখের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দিতে পারে? তা হলো তোমরা ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, জিহাদ কর আল্লাহর পথে জান এবং মাল দিয়ে।"

এ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরজ। শুধু ফরজ বললে বোধ হয় পুরা বলা হয় না বরং বলা যায় সব ফরজের বড় ফরজ। কারণ এ ফরজ আদায় না করলে অন্যান্য ফরজ আদায় করা কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দ্বীনের একটা ফরজ কাজ পালন করার জন্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই মসজিদকে আমরা কতবড় মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয় বরং বলা যায় দিতে বাধ্য থাকি। আর ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সকল বিধানকে সমাজে ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

মানুষ আল্লাহর খলিফা, খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহপাক তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। খেলাফতের এই দায়িত্ব তারা পালন করবে মানুষের মনগড়া কোন মতবাদ বা পথে নয় বরং আল্লাহর দেয়া দ্বীনের ভিত্তিতে। আল্লাহর আইনকে জীবনের সর্বস্তরে চালু করার জন্যে প্রয়োজন একটা সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। যে সুসংঘবদ্ধ জীবনের উদাহরণ নবী রাসূলগণ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে দেখিয়ে গেছেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে এই বিপ্লবী আন্দোলনই করে গেছেন। এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ কোরআন এবং হাদীস থেকে সরাসরি প্রমাণিত। আল্লাহর খলিফা হিসেবে আমাদের ঈমানের দাবীই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে অংশ গ্রহণ, যা আখেরাতের মুক্তির একমাত্র উপায়। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে রাসূলের অনেক হাদীস রয়েছে। যেমনঃ-

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন " এক লোক রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, - আমাকে এমন কোন আমলের সন্ধান দিন যা জিহাদ ফি সাবিল্লাহর সমতুল্য। রাসূল (সাঃ) বললেন এমন কোন আমল আমি পাইনা যা জিহাদের সমতুল্য। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন,

আন্দোলন কাকে বলে? এর গুরুত্ব কি?

বাংলা "দোলন" শব্দ থেকে আন্দোলন শব্দটি এসেছে। ইংরেজীতে আন্দোলনকে Movement বলে। Movement অর্থ নড়াচড়া করা। আন্দোলনের আরবী حركت এরও অর্থ নড়াচড়া করা। কোন অধিকার আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরতিহীন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠার নাম আন্দোলন। আন্দোলনের উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে, আন্দোলন একা একা করা যায় না। আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন একই উদ্দেশ্যের কিছু লোককে সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হওয়া। আন্দোলনের লক্ষ্যে গঠিত দলের যেমন একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে তেমনি এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে একটা সুন্দর কর্মসূচী এবং সেই দলকে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে অবিরাম কাজ করে যেতে হবে। দুনিয়ার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মনগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন হয়েছে, যেমন- লেনিন, মাওসেতুং এর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ভাষা ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের আন্দোলন, তা ছাড়া কোন এক ব্যক্তিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানোরও আন্দোলন হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন কোন মানুষের মনগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠা বা কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো অথবা কোন ভাষা বা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, দুনিয়া জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাকের দেয়া জীবন বিধান কায়েমের জন্যেই হয়ে থাকে। নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এমন আন্দোলন যার মাধ্যমে আল্লাহর আইনকে বাস্তবে কায়েম করা যায়। ইসলামী আন্দোলন তাকেই বলে, যা একজন মানুষ বা মানুষের কোন মনগড়া মতবাদ নয় বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে একমাত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন। কোরআন মজিদে আল্লাহপাক ইসলামী আন্দোলনকে আল্লাহর পথের জিহাদ বলে ঘোষণা করেছেন। জিহাদ অর্থ চেষ্টা, সাধনা, প্রচেষ্টা। দুনিয়ার মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ যে বিধান বা পথ নবী রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাই হচ্ছে আল্লাহর পথ। আর আল্লাহর এই বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান হয় তারই নাম আল্লাহর পথে জিহাদ।

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ নূহ (আঃ) কে দিয়েছিলেন। আর এখন তোমার প্রতি যে হেদায়েত ওহির মাধ্যমে পাঠিয়েছি, আর সেই হেদায়েত যা আমি ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এর প্রতি পাঠিয়েছিলাম (সব নির্দেশের সার কথা ছিল) যে, তোমরা দ্বীন কায়েম করার ব্যাপারে পরস্পরে দলাদলিতে লিপ্ত হইও না।" (সূরা–শুরা)

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ পাক এই কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, ব্যক্তিগত ভাবে ইসলামী আইন পুরোপুরিভাবে কখনও মেনে চলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় ভাবে এ আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। যেহেতু আমাদের সমাজে সর্বত্র ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত নেই, তাই সর্বস্তরে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো দরকার। করা দরকার আন্দোলন।

আমরা সেখানে শুধু দেখতে পাই হতাশা আর নৈরাজ্য কিন্তু কেন? কারণ নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি হওয়ার জন্যে তাদের সামনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, যে পাঠ্যসূচী থাকা উচিত ছিল তা আজ আর নেই। বরং সেখানে রয়েছে কিভাবে মানুষকে ঠকিয়ে তাকে হত্যা করে বড় লোক হওয়া যায়। কতটুকু দুধের সাথে কতটুকু পানি মিশালে লাভবান হওয়া যায়। ছাত্ররা এখন শিক্ষককে অসম্মান করে, প্রহার করে, পরীক্ষায় নকল করতে না দিলে পরিদর্শককে খুনের ভয় দেখায়, আগে এর কোনটাই ছিলনা। কারণ আগেকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, কিভাবে শিক্ষককে সম্মান করতে হবে, মানুষের আমানত রক্ষা করতে হবে, কি করে সৎচরিত্রবান হওয়া যায় সর্বোপরি আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষাও দেওয়া হত। মানুষের ভেতর যদি আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আজকাল পাঠ্য পুস্তক, সিনেমা টেলিভিশন, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকেই ছেলে মেয়েরা কুশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে । কাজেই তাদের কাছ থেকে আমরা কতটুকু ভাল আশা করতে পারি?

আমি কারো সমালোচনা করতে চাইনা। কিন্তু সামান্যতম সাধারণ বিবেক, জ্ঞানও যাদের আছে, তারাও বুঝতে পারবেন যে এরপরও আমরা যুবকদের উত্তম চরিত্রের আশা কিভাবে করতে পারি। যেখানে নৈতিকতার সামান্যতম শিক্ষাও একটা শিশুর মস্তিস্কে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হয় না। বরং যাবতীয় খোদাহীনতা ও বেহায়াপনা শিক্ষা দেয়া হয়, সেখানে কি করে আমাদের সমাজ কলুষমুক্ত হতে পারে? আমরা কিভাবে আশা করতে পারি একটা সুস্থ বিবেক সম্পন্ন সমাজ?

অর্থনৈতিক জীবনেও আল্লাহর বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সেখানে সুদ-ঘুষ বর্জন করতে পারছিনা। অনোন্যপায় হয়ে আমাদের অফিসে আদালতে ঘুষ দিতে হচ্ছে। অতএব এককথায় আমরা বলতে পারি দ্বীন বা আল্লাহর বিধান সমাজে চালু না থাকলে কিছুতেই ব্যক্তিগত ভাবে ইসলামী আইন মেনে চলা সম্ভব নয়। তাই পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামী আইন মেনে চলতে হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী আইন থাকা দরকার। এ জন্যই দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, এ দায়িত্ব সমস্ত নবী রাসূলগন (সাঃ) পালন করে গেছেন। আল্লাহ পাক বলেছেন-

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

আদালতে, হোটেল রেস্তোরায়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট বা ব্যক্তিগত সহকারীর পদে বড় বড় কর্মকর্তার জন্যে নারী এমন কি অবিবাহিতা যুবতীর জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন।

পর্দা প্রথা চালু না থাকার কারণে নারী যেভাবে নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছে তা প্রায়ই দৈনিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই দেখা যায়। নারী নির্যাতিত হচ্ছে স্বামীর কাছে। খোঁজ করলে দেখা যায় স্বামী অফিসের একজন মহিলা কর্মচারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখে। নারী নির্যাতিত হচ্ছে প্রেমিকের হাতে। এমন কি এসিড নিক্ষেপে চক্ষু অন্ধ হচ্ছে অথবা নিহত হচ্ছে। কারণ প্রেমিক সন্ধান পেয়েছে অন্য একজন প্রেমিকার। সহশিক্ষার পরিণতিতে হত্যার খবর যা ছাপা হয়েছে তার মধ্যে আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহার বানু হত্যা। সহপাঠী বন্ধু তাকে হত্যা করেছে।

পর্দা না থাকায় প্রভাবশালী লোকের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে সমাজের নিম্নস্তরের মেয়েরা। অনেক সুখের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। কয়েক সন্তানের পিতা যুবতী মহিলাকে পাওয়ার জন্যে স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। শুধু যে পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে তাই নয়, কয়েক সন্তানের মাও স্বামী সন্তান রেখে অন্যের হাত ধরে চলে যাবার খবর পত্রিকায় ছাপা হতে দেখা যায়। আজকাল মেয়েরা যে ভাবে রাস্তাঘাটে বেপর্দাভাবে চলা ফেরা করে, তাতে যদি পুরুষ পর্দা মেনে চলতে চায় তবে তার পক্ষে বাজার ঘাট বন্ধ করে ঘরে বসে থাকা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

একটা কথা অনেকেই বলেন যে, নারীদের আগের মত এখন আর তেমন সম্মান বা মর্যাদা দেয়া হয়না। বরং মেয়েদের বাজারের পণ্যের মত ব্যবহার করা হয়, মনে করা হয় শুধু ভোগের সামগ্রী রূপে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাছে টেনে নেয়, প্রয়োজন ফুরালে কলার খোশার মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কোন সমাজের যদি সত্যিকার চিত্র এই হয়, তাহলে সে সমাজের নারীর কোন কল্যাণই সম্ভব নয়। আমাদের প্রশ্ন– এর জন্য কি শুধু পুরুষরাই দায়ী? না আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সমাজের এই অধঃপতনের জন্য নারীরূপী কিছু উচ্ছৃঙ্খল বেহায়া যুবতীই বেশী দায়ী।

আগে মেয়েদের সবাই সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত। এখন করেনা। কিন্তু কেন? সম্মানের উচ্চ শিখর থেকে তারা কি নিজেরাই নেমেছে না কেউ তাদের নামিয়ে দিয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

নারীরা যেমন আজ পথহারা তেমনি একজন পুরুষও আজ পথহারা, নৈতিক দেউলিয়াপনার শিকার। আজকে আমাদের যুব সমাজের দিকে তাকালে

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে সমাজে নামাজ কায়েম করার জন্যে তাদের ওপরে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায় এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করলেই আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করলো বলে প্রমাণিত হয়। যেখানে সরকার বা কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্র নির্ধারিত নামাজ প্রতিষ্ঠার হুকুম মেনে চলার জন্যে জনগণের প্রতি নির্দেশ না দেয় সেখানে অনেক মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশিত ফরজ কাজকেও অমান্য ও অবহেলা করে চলে। যেমন আমাদের দেশে নামাজ আদায় করার জন্যে বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক না করায় সেখানে নামাজ যে ফরজ তা পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ যার ইচ্ছা সে নামাজ পড়ে যার ইচ্ছা হয় না সে নামাজ পড়ে না। সেরূপ ধনীদের প্রতি আল্লাহ্ হজ্জ্ব ফরজ করেছেন। কিন্তু সরকারী ছাড়পত্র না পেলে একজন লোক যার ওপর হজ্জ্ব ফরজ হয়েছে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে হজ্জ্ব পালন করতে পারে না। এতে বোঝা যায় আল্লাহ্র হুকুম যেন সরকারের অধীনে পরিণত হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। যারা ক্ষমতাশীন হবে অর্থাৎ যারা সরকার গঠন করবে, জাকাত ব্যবস্থা চালু করার জন্যেও তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। জাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। আর রোজা তো এমন এক পরিবেশ দাবী করে যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়া সমাজ জীবনে এমন অনেক দিক ও বিভাগ রয়েছে যার সম্পর্কে আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলতে পারছি না। যেমন আল্লাহ্ পাক সকল পুরুষ ও নারীর জন্যে পর্দা ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র এই বিধান চালু না থাকায় নারী নির্যাতিত ও অবহেলিত। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে পর্দা প্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। নারী ও পুরুষের সৃষ্টি রহস্যই এমন যে পর্দা প্রথার অভাবে সমাজে বিশৃংখলতা, অশান্তি, ভাংগন, বিপর্যয় দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু একটা মুসলিম দেশের নাগরিক হয়েও আমরা কি পর্দাপ্রথা মেনে চলতে পারছি? নারী পুরুষের দেখাশোনা কথাবার্তা যাদের মধ্যে হতে পারে তা আল্লাহ্পাক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র এ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে চলা কি আজ সম্ভব হচ্ছে? আল্লাহ্ পর্দাপ্রথা ফরজ করলেও সরকার যদি পর্দা মেনে চলার নির্দেশ জারী না করেন, পর্দা মেনে চলার মত সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করেন তবে ব্যক্তিগতভাবে পর্দা মানা কি সম্ভব? কিছুতেই না। আমাদের সমাজে পর্দাপ্রথা মেনে চলার জন্যে সরকারী নির্দেশ তো দূরের কথা সহশিক্ষা ও সহচাকুরীর এমন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যে পর্দার মত আল্লাহ্র একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মেনে চলা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। বড় বড় অফিস

বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই। আগেই বলেছি, আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষের তৈরী মতবাদকে উৎখাত করে সেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু আজ নামাজ রোজার মত ইসলামের মৌলিক ইবাদতও মানুষের দ্বারা গঠিত সরকারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজে এখন আল্লাহর বিধান ততটুকু চালু আছে যতটুকু পালন করার অধিকার সরকার বা কর্তৃপক্ষ আমাদের দিয়েছেন। আমরাও ততটুকুতে সন্তুষ্ট, আল্লাহর যতটুকু বিধান পালন করলে আমাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয়, কায়েমী স্বার্থের সাথে কোন সংঘাত না বাঁধে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাইতো সমাজ জীবনের চাবিকাঠি যাদের হাতে থাকে মানুষ স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাই ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের সকল দিক মেনে চলাতো দূরের কথা, নামাজ রোজা, হজ্জ্ব, যাকাতের মত মৌলিক ইবাদত সমূহও পালন করা সম্ভব নয়। নামাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে পড়ার জন্যে নয় বরং সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠারই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ পাক। নামাজ সমস্ত অশ্লীলতা ও পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। নামাজ মানুষের মধ্যে খোদা ভীতি সৃষ্টি করে। আর খোদার ভয় সৃষ্টি হলেই মানুষ সব রকম অন্যায় এবং কুকাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। ফলে সমাজে আসে শান্তি।

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু নামাজও আদায় করা সম্ভব নয়, যদি নামাজ আদায় করার মত উপযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হয়। নামাজ, রোজা, যাকাত প্রভৃতি মৌলিক ইবাদত সমূহ পালনের জন্য উপযুক্ত সমাজ গঠনের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক সমাজের নেতাদের ওপর অর্পণ করেছেন।

সুরা হজ্বের ৪১ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

"এরাতো ঐ সব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে বাঁধা দান করবে।"

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর হুকুম তথা ইসলামের বিধি বিধান সমাজে জারি করার জন্যে ক্ষমতাসীন মুসলমানদের ওপর নামাজ ফরজ করা হলেও যে সমস্ত লোকেরা

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালন নবী রাসূলগণ করে গেছেন। আমাদের প্রিয় নবী এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বিধান ইসলামকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী বিধানের উজ্জ্বল সাক্ষী রেখে গেছেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথে সংগ্রাম করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে আল্লাহর আইন বাস্তবভাবে চালু করেন এবং তা দীর্ঘদিন স্বীয় বৈশিষ্ট্যসহ দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ এক দিনের জন্যও তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দুনিয়ায় আর যেহেতু নবী রাসূল আসবেন না এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর উম্মতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন এবং যেহেতু আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে তাঁর বান্দার প্রতি ফরজ করেছেন সেহেতু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ কাজ সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীর। একামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন– "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা ভাল কাজের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজে বাধা দিবে।"

এ থেকে বুঝা যায় যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ অথবা আল্লাহর বিধান চালু করার দায়িত্ব ঐ সব মুমিন বান্দার যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এমন একদল লোক তৈরী করা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য অপরিহার্য।

বর্তমানে কি আমাদের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে?

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যে বিধান চালু হলে দুনিয়ার সকল মানুষ শান্তি এবং কল্যাণ পাবে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে সংগ্রাম করে বা প্রচেষ্টা চালিয়ে নবী রাসুল (সাঃ) গণ সমাজে যখন আল্লাহর দ্বীন চালু করেছেন তখনই সেই সমাজে এসেছে শান্তি ও কল্যাণ।

আমাদের বর্তমান সমাজে যে ভাবে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বেহায়াপনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অস্থিরতা, সুদ, ঘুষ চালু আছে তা দেখে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী যে কোন মানুষ এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আল্লাহর বিধান এখানে চালু নেই। কারণ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকলে উপরোক্ত অবস্থা চালু থাকতে পারে না। একথা শুনে নিশ্চয়ই আপনি আশ্চায্য হচ্ছেন যে, আমাদের সমাজে কালেমা পড়ার, তাসবিহ পড়ার, নামাজ, রোজা করার লোকের তো অভাব নেই? তবুও কি করে আমরা বলতে পারি যে আল্লাহর

আবর্তিত হচ্ছে। পশু-পাখী, জীব-জন্তু সবাই তাদের নিজস্ব রাজ্যে স্রষ্টার দেয়া বিধানই মেনে চলছে।

দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছু এক মহা শক্তিশালী বিধানকর্তার সৃষ্টি এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত সেই বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে। সবাই মেনে চলছে তাঁরই দেয়া নির্দিষ্ট বিধান বা নিয়ম। আর আল্লাহর আনুগত্য করা বা তাঁর ওপর আত্মসমর্পনের নামই হচ্ছে–ইসলাম।

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা– আত্ম সমর্পন করা। আমরা দেখেছি আল্লাহর সকল সৃষ্টিই তাঁর বিধান মেনে চলছে যার ফলে প্রাকৃতিক জগত, প্রাণী জগত, সৌরজগতে কোথাও কোন বিপর্যয় নেই, নেই কোন অশান্তি বরং সব জায়গায় আছে শান্তি ও কল্যাণ। তাইতো ইসলামের আর এক অর্থ শান্তি। এই শান্তি কোন নীতিকথা নয় বা নয় কোন শান্তি মূলক কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহর বিধান মানলেই শান্তি আসতে পারে। সমাজে বা রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান চালু থাকলে মানুষ শান্তিতে থাকবে। আজ আল্লাহর বিধান সর্বত্র চালু না থাকায় দুনিয়ায় যত অশান্তি। দুনিয়ার এ অশান্তি দূর করার জন্যে এবং দুনিয়ায় নিজে ও অন্যের অর্থ্যাৎ সকল মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কার?

যুগে যুগে মানুষের তৈরী মনগড়া মতবাদ উৎখাত করে আল্লাহর বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ পাক নবী রাসূল (সাঃ) পাঠিয়েছেন।

নবী রাসূলদের (সাঃ) দুনিয়ায় প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআন পাকে বলেছেনঃ-

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা ও দ্বীনে হক সহকারে অন্যান্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।"

(সুরায়ে আস-সাফ-৯)

নবী রাসূলগণ (সাঃ) যে দ্বীনে হক নিয়ে এসেছেন তা-ই ইসলাম এবং একমাত্র সত্য ও বাস্তব বিধান। মানব রচিত মতবাদ ও বিধান ভ্রান্ত। আল্লাহর বিধানকে দুনিয়ায় বিজয়ী করা অর্থাৎ মানব রচিত বিধানের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম কাকে বলে?

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্ পাক তাঁর কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

"ইন্নাদ্দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম" অর্থাৎ ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ্র দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের বিধান রয়েছে ইসলামে। মানুষ কি দেখবে কি দেখবে না; কি খাবে কি খাবে না, কিভাবে চলবে কিভাবে চলবে না, কি করবে কি করবেনা– মোট কথা কোন্টা হারাম কোন্টা হালাল, ইসলাম তা বলে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবনে মানুষ কোন্ পথে ও কিভাবে আয় করবে, কিসে ও কিভাবে ব্যয় করবে? উদ্বৃত্ত সম্পদ কি করবে? তা বলে দিয়েছে ইসলাম।

পারিবারিক জীবনে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্যও ইসলামে বলা হয়েছে। এক ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তিতে পুত্রের, কন্যার, স্ত্রীর বা স্বামীর, পিতা, মাতার অংশও বলা হয়েছে ইসলামে।

এভাবে মানুষের সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবনসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের কথা ইসলামে আছে বিধায় ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা হয়েছে।

আমাদের সমাজে অনেকে মনে করেন, ইসলাম মানুষের কিছু এবাদত বন্দেগীর মধ্যে্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু আসলে তা নয়, বরং ইসলাম যে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের রীতি-নীতি ও বিধান বলে দিয়েছে তা আগেই আলোচনা করেছি।

আল্লাহ যে শুধু মানুষের জন্য বিধান দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর সকল সৃষ্টির জন্যই বিধান দিয়েছেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি, ইসলাম সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার দেয়া জীবন বিধান আর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যারাই তাঁর বিধান মানে, তারাই শান্তি পায়। তাই আমরা দেখি প্রাকৃতিক জগতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রসহ বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি চলছে এক অপরিবর্তনীয় বিধান মেনে, স্রষ্টার দেয়া নিজ নিজ কক্ষ পথে। পৃথিবী আল্লাহর নির্ধারিত গতিতে নির্দিষ্ট সময়ে তার নিজ পথে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ইসলাম কাকে বলে?	৫
২। ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কার?	৬
৩। বর্তমানে কি আমাদের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে?	৭
৪। আন্দোলন কাকে বলে? এর গুরুত্ব কি?	১৩
৫। ইসলামী আন্দোলনের কাজ কি শুধু পুরুষদের?	১৫
৬। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনে মহিলাদের অবদান	১৮
৭। ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকাঃ	৩৬
❑ ব্যক্তিগত জীবন	
❑ সামাজিক জীবন	
❑ রাজনৈতিক জীবন	
৮। ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর কাজ-	৪৯
৯। বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন-	৫৯

লেখিকার কথা

ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীদের উপযোগী অনেক বই বাজারে আছে। এটা আমাদের সৌভাগ্য। সে সব বই পুস্তক পড়ে এবং বাস্তবে কাজ করতে যেয়ে মহিলা কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বাস্তব কিছু কথা বহুদিন থেকে মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেগুলোকে কাগজের পাতায় লেখা শুরু করলাম। কিছু কিছু লেখা পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ছাপাও হলো। ভাবলাম বই আকারে লিখে রাখি-তাই **"ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য"** নাম দিয়ে এই বইখানা তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন করলাম।

বই আকারে এটা আমার নুতন লেখা। আমার জ্ঞানও সামান্য। ভাষাও দুর্বল। কিন্তু মনের আবেগেই লিখতে বাধ্য হলাম।

তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ করতে যেয়ে বেশ কিছু ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্বহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি ভাষা ও ছাপার ভুল আমাকে জানান তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যারা সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ শেষ হওয়াতে চাহিদার প্রেক্ষিতে পঞ্চম সংস্করণ ছাপা হল।

বইটি পাঠ করে ইসলামী আন্দোলনে কর্মরত আমার মা-বোনেরা সামান্যতম উপকৃত হলে আমার চেষ্টা স্বার্থক হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ

বেগম রোকেয়া আনছার

এনামসহ অবতীর্ণ হয়েছিল। আফসোস! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম এবং আমার শক্তি থাকত যখন আপনার জাতি আপনাকে নির্বাসিত করবে। রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন, তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? ওরাকা জবাব দিলেন–হ্যাঁ, ইহা যখন কারও পর নাযিল হয় তখন দুনিয়া তার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে দেয়। আমি যদি সে সময় জীবিত থাকি তাহলে আপনার সাহায্য করব। ওরাকা এ ঘটনার কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। যুগান্তকারী এ বিপ্লবী কালেমা মানুষের জন্যে বয়ে নিয়ে এসেছিল নির্যাতিত মানবতার মুক্তি এবং সর্ব প্রকার কায়েমী স্বার্থের পতন। সে যুগের কায়েমী স্বার্থবাদীরা এ কালেমাকে সহ্য করতে পারেনি। একজোটে নির্যাতনের স্টীম রোলার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলকামী ইসলামী আন্দোলনের এ কাফেলাটিকে আরবের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করার সকল প্রকার অপকৌশল গ্রহণ করলো তারা। খাদীজা (রাঃ) তাতে একটুও দমলেন না। নতুন আন্দোলনের সহকর্মীদের সুখ দুঃখে তিনিও সমভাগী হলেন। নবী করীম (সাঃ) এর সঙ্গে শের পর্বতের গুহায় আটক থাকার সময় সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন অকাতরে সহ্য করে তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কে। বিপদ মুসিবতের সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েও তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন। দ্বীনের দাওয়াতের কাজে বিরুদ্ধবাদীদের কথা এবং ব্যবহারে রাসুল (সাঃ) যে আঘাত পেতেন তা খাদিজার (রাঃ) সাহচর্যে এলে দূর হয়ে যেত।

বিপুল অর্থের অধিকারী আরবের এ ধনাঢ্য মহিলা কলেমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" মুখে বলেছেন তাই নয়, নবীর উপস্থাপিত আদর্শ বাস্তবায়নে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে অকৃপণ হাতে নিজে অঢেল সম্পদ ব্যয় করেছেন। তিনি কখনও নিজেকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক মনে করতেন না। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এ দুনিয়া জাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং এর যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর। মানুষ শুধু আমানতদার মাত্র। তাই তিনি আল্লাহর দেয়া সকল সম্পদ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর নবীর স্ত্রী এবং অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। নিজ হাতে স্বামীর সেবা শুশ্রুষা করতেন। ইসলামী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে রাসুলে করীম (সাঃ) কে সক্রিয় সহযোগীতা করার পর যে সময়টুকু তিনি পেতেন তা তিনি ব্যয় করতেন সাংসারিক কাজে।

একদিন রাসূলে করীমের কাছে জিব্রাইল (আঃ) আসলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, "খাদীজা থালায় করে কিছু নিয়ে আসছেন! আপনি তাঁকে আল্লাহর এবং আমার সালাম পৌঁছে দিন।"

হযরত খাদীজা (রাঃ) হিজরতের তিন মাস পূর্বে ১১ই রমজান ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহর প্রিয় নবী তাঁর জীবন সংগিনীর ইন্তেকালে এ সনকে শোক সাল হিসেবে উল্লেখ করেন। খাদীজার (রাঃ) ওফাতের পর নবী করীম (সাঃ) তাঁকে স্ত্রী হিসেবে যতটুকু স্বরণ করতেন তার চেয়েও বেশী স্মরণ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। কোন ভাল জন্তু জবেহ্ করা হলে তিনি তাঁর গোশত পাঠিয়ে দিতেন খাদীজার (রাঃ) বান্ধবীদের বাসায়।

হযরত আশেয়া (রাঃ) একদিন অনুযোগ করে বলেছিলেন, আপনি এমন এক বৃদ্ধার কথা স্মরণ করছেন যিনি জীবিত নেই। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। নবীকরীম (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন– "কখনও নয়, মানুষ যখন আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে তখন সে ইসলাম কবুল করেছে। আমার যখন সাহায্যকারী ছিলনা তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে।"

হযরত আশেয়া (রাঃ) ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রী এবং মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) কন্যা। হযরত আয়েশা রাসূলে করিমের (সাঃ) নবুয়্যত লাভের ৪ বৎসর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত খাদীজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) সাথে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। এর ৩ বৎসর পর মদীনায় তাঁর রসুমত অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। মাত্র নয় বৎসর দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর তিনি বিধবা হন। এ নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে রাসূলের সঙ্গে থেকে তিনি প্রকৃত অহীর জ্ঞান লাভ করেন, আর এ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি অর্জন করেছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ন্যায়ের পথে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন ইস্পাত কঠিন চরিত্র। রাসূলের সাহচর্যে থেকে তিনি দেখেছিলেন ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা এবং বুঝেছিলেন ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কখনও সম্ভব নয়। আর নবী রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্যও তাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, গভীর মনোযোগী ও অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারিণী। তিনি অতি অল্প বয়সের মধ্যে কোরআন,

হাদীস, ও ইসলামী বিপ্লবে রাসুলের (সাঃ) জীবনের বিভিন্নস্তর সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর মধ্যে কোন প্রকার অহংকার ছিলনা। কোরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান ছিল, তা তিনি নিরলসভাবে অন্যকে শিখাতেন। তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্যে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধা, যুবক সকল শ্রেণীর লোক আসত। জ্ঞান বিতরণে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

ইসলামী আন্দোলনের তদানিন্তন মহিলা কর্মীদের মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সমপর্যায়ের জ্ঞানী ছিলেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুঝতে না পেরে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসতেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে তিনি বিভিন্ন জটিল বিষয়ে রায় দিতেন। তাঁর সময়েই ইবনে আবু সাইখ তাবেয়ী প্রত্যেক নামাজের পর দীর্ঘ মোনাজাত করতেন। আয়েশা (রাঃ) জানতে পেরে তাঁকে বললেন, সপ্তাহে একদিন বা উর্দ্ধে তিন দিনের বেশী বক্তৃতা করবেন না এবং মোনাজাত সংক্ষেপে করবেন। কাব্যিক ভাষায় মোনাজাত করার দরকার নেই। দীর্ঘ বক্তৃতা, উপদেশ ও দোয়ার দরুন মানুষকে পেরেশান করার নিয়ম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের ছিলনা। ফজরের নামাজের সময় দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও শুধু দু'রাকাত ফরজ নামাজ, দু'রাকাত সুন্নত, নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেন না। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বলেন, "ফজরের নামাজে দীর্ঘ কেরাত পাঠ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে বেশী নামাজ রাখা হয়নি।" অনুরূপভাবে আসর ও ফজরের নামাজের পর অন্য কোন নামাজ না পড়ার জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে অনেকে বুঝতে না পেরে তাঁর কাছে আসেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেনঃ সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় নামাজ আফতাব পোরস্তদের সংগে সামঞ্জ্যশীল বিধায় তা নিষেধ করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) বসে নফল নামাজ পড়েছেন এবং এ কারণেই অনেক লোক বসে নামাজ পড়েন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল করিম (সাঃ) দুর্বল অবস্থায় তা করতেন।

এভাবে বহু জটিল সমস্যার সমাধান তিনি খুব সুক্ষ্মভাবে কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সমাধান করেছেন। তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা, সূক্ষ্মতা, তীক্ষ্নতা সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি যা বলেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

হযরত আবু মুসা আসআরী (রাঃ) বলেন, তাঁকে কঠিন বিষয় জিজ্ঞেস করে কিছু তথ্য না পেয়ে আমি ফিরে আসিনি।

ইমাম জহুরী বলেনঃ আয়েশা (রাঃ) শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞান আহরণ করেছেন। সকল নবীপত্নী ও সকল পুরুষের জ্ঞান একত্র করলেও আয়েশার জ্ঞান প্রশস্ততর হবে।

ওরওয়া বিন জুবায়ের বলেন ঃ

কোরআন, ফারায়েজ, হালাল, হারাম, ফিকাহ, আরবের ইতিহাস, গোত্র বংশপঞ্জী এবং চিকিৎসা বিদ্যায় হযরত আয়েশার (রাঃ) সমতুল্য কেউ নেই। তিনি খুব ভাল বক্তা ছিলেন, জাঙ্গে জামালের সময় তিনি এক জোরালো ও বলিষ্ঠ বক্তৃতা করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অসাধারণ দানশীলা ছিলেন। কোরআন হাদীস অধ্যায়ন করে তিনি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধন সঞ্চয়ের মধ্যে কোন সার্থকতা নেই; বরং বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। আমীর মাবিয়া তার শাসনকালে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করেন। সূর্যাস্তের আগেই তিনি তা বিলিয়ে দেন।

রাসূল (সাঃ) এর জীবিত কালে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তেন। পরবর্তী কালে নবীপত্নী তা নিষেধ করেন। তিনি বলেন, রাসূলে করিম (সাঃ) যদি জানতেন যে, মেয়েদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা হলে তিনিও বনী ইসরাঈলদের মেয়েদের ন্যায় মুসলমান মেয়েদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন।

শেরক, বিদয়াত ও অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্যে তিনি খুব তৎপর থাকতেন। তখন কাবা শরীফের গিলাফ প্রতি বছর খুলে দাফন করা হতো। মানুষ যাতে এ পবিত্র ঘরের চাঁদর স্পর্শ করতে না পারে সে জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি কাবা শরীফের হেফাজতকারীকে বললেন, এটা যুক্তিসংগত নয়। যখন গেলাফ খুলে ফেলা হয়েছে তখন যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারে। তিনি উহা বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করার জন্যে বলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কেউ তাঁর প্রশংসা করুক তা পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রশংসা করতে পারে এ আশংকায় তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জনৈক সাহাবীকে তাঁর সাথে দেখা করতে দিতেও রাজী ছিলেন না। আখেরাতের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর কথা থেকে! মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলতেন, "হায় আফসোস! আমি যদি জন্ম গ্রহণ না করতাম, আমি যদি পাথর হতাম, আমি যদি

একখন্ড মৃত্তিকা হতাম।" তাঁর স্বাস্থ্যেরকথা যদি কেউ জানতে চাইতেন, তবে বলতেন, আলহামদুল্লিাহ্ আমি ভাল আছি।

৬৩ বছর বয়সে হিজরী ৫৮ সালের ১৭ই রমজান তিনি ইন্‌তেকাল করেন। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য এক বিরাট আদর্শ।

হযরত সুমাইয়া (রঃ)ঃ হযরত সুমাইয়া ছিলেন আব হোযায়ফা বিন মুগীরা মুখযুমের ক্রীতদাসী। আরবের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি ছিলেন নীচু বংশের মহিলা। তিনি খুব চিন্তাশীলা, বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। চিন্তা ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি আরবের যে কোন শরীফ–খান্দান মহিলাদের চেয়ে কম ছিলেন না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আম্মারের মা ছিলেন। হযরত আম্মার ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপনকারী ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত গ্রহণ করেন। সারা আরব যখন রাসূলের (সাঃ) আন্দোলনের বিরুদ্ধে তখন তিনি এ সত্যকে কবুল করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এ সত্যকে কবুল করার যে ভয়াবহ পরিণতি তা তিনি জানতেন কিন্তু তাতে তিনি ভীত ছিলেন না, তিনি ইসলাম কবুল করায় মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র সাত।

সমাজ জীবনের ধারা আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করার আন্দোলনে হযরত সুমাইয়ার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও চির অবহেলিত মহিলাকে দেখে সমাজপতিদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছিল। এ আন্দোলনে নুতন কেউ যোগদান করলে তারা বরদাস্ত করতে পারতো না। তাই হযরত সুমাইয়ার ওপরে নেমে এসেছিল নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। আল্লাহ্‌র পথের এ বিশ্বস্ত মহিলা কর্মী ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। সেই নির্যাতনের মুখেও ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি স্বামী ও পুত্রসহ আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন আল্লাহ্‌র পথকে। নির্যাতনের ফলে স্বামী ইয়াসির মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু এতেও সুমাইয়া বিন্দুমাত্র দমলেন না। পুত্র আম্মারকে নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথে, সত্যের পথে, অটল দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা আরও তীব্র ও কঠিন নির্যাতন শুরু করলো। নরপিশাচরা হযরত সুমাইয়াকে মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপরে শুইয়ে দিত। মাথার ওপরে প্রচন্ড সূর্য্যের তাপ এবং নীচে তপ্ত বালুর মধ্যে সারাদিন শুইয়ে রাখত। রাত্রে ঘরে ফিরিয়ে আনতো এবং ইসলামী আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্যে তাকে চিন্তা করার সময় দিত। পরদিন আরও কঠোরভাবে নির্যাতন চালাত।

কিন্তু তিনি ঈমান ত্যাগ করেন নাই। রাসূল (সাঃ) তার নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন, তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করতেন, "হে ইয়াসির পরিবার, এর বদলে তোমাদের জন্যে বেহেস্ত রয়েছে।"

একদিন সুমাইয়া (রাঃ) সারাদিন নির্যাতন ভোগের পর যখন ফিরলেন, তখন আবু জেহেল তাঁর ঘরে এসে হাজির। অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। এতেও তাঁর রাগ পড়লো না। বর্শা দিয়ে আঘাত করলো, ইসলামী আন্দোলনের বীর মোজাহেদা হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এর বুকে। কাফের সরদার আব জেহেলের বর্শার আঘাতে হযরত সুমাইয়া (রাঃ) শহীদ হলেন আর ইসলামী আন্দোলনের শহীদের কাতারে প্রথম নাম লেখালেন একজন সংগ্রামী মহিলা। সকল যুগের মহিলাদের গৌরব হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।

হযরত উম্মে সালেম (রাঃ) ঃ হযরত উম্মে সালেম (রাঃ) রমিজা ও গমিজা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল লমহান বিন খালিদ এবং মাতার নাম ছিল মালেকা বিনতে মালেক। তিনি রাসূলে পাক এর খালা হতেন। মালিক আবু নসর ছিল তাঁর প্রথম স্বামী। আর দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবু তালহা। হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন তাঁর প্রথম ঘরের সন্তান। তিনি তাঁর সূক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সঠিক জ্ঞানের কারণে রাসূল (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করলেন এবং মুসলমান হলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবু নসর কাফেরই রয়ে গেল। স্বামীর সাথে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। কিন্ত হক ও বাতিলের সংঘর্ষে এ সম্পর্ক টিকলো না। দ্বীনে হক ও ইসলামী আন্দোলনের কারণে স্বামীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। উম্মে সালেমের এ কোরবানী এক স্বতন্ত্র উদাহরণ। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁর সঞ্চিত সকল ধন সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, হযরত সুমাইয়া (রাঃ) উৎসর্গ করে ছিলেন তাঁর জীবন, আর উম্মে সালেম বিসর্জন দিয়ে ছিলেন তাঁর মধুর দাম্পত্য জীবন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর উম্মে সালেমের (রাঃ) প্রথম স্বামী মালিক আব নসর তাঁকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য নানা প্রকারের কলা কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু তাতেও যখন তিনি ইসলামী আন্দোলন করা থেকে বিরত হলেন না, তখন প্রচন্ড আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে মালিক আবু নসর দেশ ত্যাগ করলো। মালিক হয়তো আশা করেছিল যে, স্বামীর মায়ায় সে আদর্শ ত্যাগ করবে। কিন্তু হযরত উম্মে সালেমের ঈমান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁর বিশ্বাসে ছিলনা কোন রকম কৃত্তিমতা। বিশ্বাসও কাজে কোন রকম গরমিল ছিল না। তিনি শুধু বিশ্বাসই করতেন না যে- আল্লাহ্ ছাড়া মানুষের আর কোন ইলাহ্ নেই

বরং এ সত্যকে জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেন। স্বামীর প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের মোহ তাঁকে আল্লাহর পথ থেকে একবিন্দুও সরাতে পারেনি। স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি কোন চেষ্টাও করেননি।

বিদেশে আবু নসরের মৃত্যুর পর আবু তালহা উম্মে সালেমের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আবু তালহা তখনো ইসলাম কবুল না করায় তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি আবু তালহাকে বললেন, " হে আবু তালহা, তুমি জান কি তোমাদের মাবুদ কে?" আবু তালহা জবাব দিল "হ্যাঁ" জবাব শুনে তিনি পুণরায় বললেন "বৃক্ষের পূজা করতে তোমার লজ্জা হয়না?" এর কিছুদিন পর আব তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন উম্মে সালেম তাঁর বিয়েতে রাজী হলেন। বিয়ের পর হযরত উম্মে সালেম স্বামীর নিকট তাঁর প্রাপ্য মোহরের টাকা মাফ করে দিলেন এবং বললেন, ইসলাম আমার মোহর। ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে হযরত সালেমের দৃষ্টিভংগির আমুল পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি তৌহিদের কষ্টি পাথরে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা যাচাই করে দেখতেন। যখন তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয় তখন হযরত তালহা বাড়ীতে ছিলেন না। রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে বললেন, ঘুমিয়ে আছে। এর অধিক কিছু বলে তিনি স্বামীকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। যথাযথ স্বামীর শুশ্রুষা করলেন। সকালে উঠে তিনি স্বামীকে বললেন, "তোমার নিকট কোন জিনিস আমানত থাকলে সে জিনিসের মালিক তা ফিরিয়ে নিতে চাইলে তুমি কি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করবে? আবু তালহা (রাঃ) বললেন, "কখনও না, আমানতের মাল আঁকড়ে ধরে রাখার অধিকার আমার নেই।" উম্মে সালেম এবার আসল কথা বললেন, "আল্লাহ্ আমাদের পুত্র ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।" হযরত আবু তালহা পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেরিতে পেয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সালেম (রাঃ) খুব ধৈর্য্যশীলা ও সহনশীলা ছিলেন। ইসলামী সমাজ রক্ষার জন্যে তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বহুবার যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন কোন প্রকার অসুবিধাই তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি ওহুদ, হোনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে নৈরাশ্য ও বিশৃংখলা দেখা দিলেও উম্মে সালেম মনোবল না হারিয়ে উৎসাহ সহকারে আহত সৈনিকদেরকে পানি পান করাতে থাকেন। হোনায়েনের যুদ্ধের মাঠে তার হাতে একটা খঞ্জর ছিল। নবী করীম (সাঃ) তা দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এটা দিয়ে কি করবে? উম্মে সালেম জবাব দিলেন, "কোন কাফের আমার কাছে আসলে তার পেটে এটা ঢুকিয়ে দেব।" আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) জবাব শুনে হাসলেন।

হযরত উম্মে সালেম সুখে-দুঃখে, ঘরে-বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে এবং বিপদের মুহূর্তে যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সাহস ও ঈমানের উজ্জ্বল নমুনা রেখে গেছেন তা আল্লাহর দ্বীনের পথে চলার জন্যে সকল যুগের মত আজও আমাদেরকে উৎসাহ যোগাবে।

হযরত উম্মে আম্মারাঃ হযরত উম্মে আম্মারার আসল নাম ছিল নাসিবা। তিনি খাজরাজ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। জায়েদ বিন আসীমের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়, দ্বিতীয় বিয়ে হয় আরবা বিন আমরের সঙ্গে।

মদীনায় ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছানোর কিছুদিনের মধ্যেই মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলাম কবুল করলেন। হযরত উম্মে আম্মারাও তাঁর বংশের লোকেরা ইসলামের এ দাওয়াত কবুল করলেন। তাঁরাও এসে শামিল হলেন এ নির্যাতিত মানবতার কাতারে। তারা তাদের জান ও মাল রাসূলের (সাঃ) নিযুক্ত প্রচারকদের কাছে সপে দিলেন। পরের বছর হজ্বের সময় উম্মে আম্মারা ও তাঁর স্বামী আরবা বিন আমরও অন্যান্য নওমুসলমানদের সংগে মক্কায় আগমন করেন। গভীর রাতে আকাবার পাদদেশে গোপন কেন্দ্রে তাঁরা আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মদিনার মুসলমানগণ রাসূল (সাঃ)কে সাক্ষী রেখে তাদের জান ও মাল আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রয় করেছিলেন বেহেস্তের বিনিময়ে। বায়াত শেষ হলে হযরত উম্মে আম্মারার স্বামী তাঁকে এবং অন্য একজন মহিলা উম্মে মুনিইকে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ দু'জন মহিলাও বায়াত গ্রহণ করার জন্যে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের যে শর্তে বায়াত গ্রহণ করা হয়েছে মহিলাদেরও সেই শর্ত। মুসাফাহা করার কোন প্রয়োজন নেই, আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করিনা। হযরত উম্মে আম্মারা ইসলামী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মহিলা কর্মী ছিলেন। তিনি বহুবার রাসূলের (সাঃ) সাথে জেহাদে শরীক হয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমে ইসলামী বাহিনীর জয় হলো, মুসলিম সৈন্যরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। যখন যুদ্ধের মোড় আবার ঘুরে গেল, কাফেররা চারিদিক থেকে নবী করীমের (সাঃ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত উম্মে আম্মারা তখন নিকটেই আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রুষা করছিলেন, নবী করিম (সাঃ) এর অবস্থা দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি রাসূলের (সাঃ) কাছে দৌড়ে আসেন এবং শত্রুদেরকে বীর বিক্রমে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর হাতে কোন ঢাল ছিল না। কোনক্রমে একটা ঢাল সংগ্রহ করে তিনি কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। ইবনে কামিয়া রাসূল (সাঃ)কে হত্যা করার জন্যে যখন সদর্পে এগিয়ে আসলো, তখন হযরত উম্মে আম্মারা তাকে বাধা

দেন। ইবনে কামিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর মাথায় মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। তিনিও কয়েক বার তাকে আঘাত করেন। কিন্তু তার শরীরে মজবুত বর্ম থাকায় তার গায়ে কোন আঘাত লাগলো না। হযরত উম্মে আম্মারার যখমটি ছিল খুব গভীর, পূর্ণ এক বছর চিকিৎসা করার পরও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। অসীম সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করেছেন। ঈমানের পরীক্ষায় তিনি জয়লাভ করেছেন। অশ্বারোহী কাফের সৈন্যরা তাঁকে আঘাত করলে, তিনি তা ঢালের সাহায্যে প্রতিহত করতেন। কাফের সৈন্য অপর দিকে মুখ ফিরালে তিনি তার ঘোড়ার পা কেটে দিতেন। ঘোড়া ধপাস করে আরোহীসহ মাটিতে পড়ে যেত। নবী করিম (সাঃ) উম্মে আম্মারার ছেলে দু'টিকে তাঁর সাহায্যের জন্যে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে শত্রু নিধনে লেগে গেল। ওহুদের যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারার পুত্র আব্দুল্লাহ্ আহত হন। তার বাহু থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিলো। নবী করিম (সাঃ) এর নির্দেশে তিনি তাঁর ছেলের হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। পুত্রের মারাত্মক যখম দেখে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। ছেলেকে শান্তনাও দিলেন না। বরং নির্ভিক ভাবে আদেশ করলেন, "যাও কাফেরদের সঙ্গে লড়ো।" নবী করিম (সাঃ) তাঁর নিষ্ঠা দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। আল্লাহ্র কাছে কয়েকবার তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "এমন সাহস কার আছে। উম্মে আম্মারা একটু পরেই তার পুত্রের আঘাতের প্রতিশোধ নিলেন। আঘাতকারী তাঁর সামনে এলে তিনি তার উরু কেঁটে দিলেন। ওহুদ যুদ্ধের সময় হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে কমপক্ষে বারটি আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছিলো।

প্রার্থিব কোন লাভের মোহে এ বীর মহিলা যুদ্ধ করেননি। বরং আল্লাহর এ জমিনে একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তিনি শত্রুর তরবারির আঘাত হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। পরকালের জীবনের সুখের জন্যে তিনি যেমন নিজে আঘাত সহ্য করছেন, তেমনি আহত পুত্রকে আল্লাহ্র পথে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন, তখন উম্মে আম্মারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দোয়া করুন যেন বেহেশতে আপনার সংগেই থাকতে পারি। নবী করীম (সাঃ) দোয়া করলেন তখন তিনি খুশি হয়ে বললেন, এখন আমার আর কোন ভাবনা নেই, দুনিয়ার যে কোন বিপদ বরদাশত করতে পারবো। ওহুদের যুদ্ধ ছাড়াও এ বিপ্লবী মহিলা খয়বার, হুনাইন, ইয়ামামা প্রভৃতি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-র শাসন আমলে তিনি একটি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর খেলাফতের সময়

ইয়ামামার জালিম সর্দার মোসায়লামা ইসলাম ত্যাগ করে। তার সাথে তার গোত্রের চল্লিশ হাজার লোকও ইসলাম ত্যাগ করে। তারা সবাই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত ছিল। তাই শক্তির মোহে অন্ধ হয়ে মোসায়লামা নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দেয়। তার এ অসত্য নবুওয়াতকে কেউ অস্বীকার করলে সে এবং তার অনুসারীরা তাদের ওপর খুব অত্যাচার করত।

একদিন উম্মে আম্মারার পুত্র হাবিব বিন জায়েদ আম্মান থেকে মদীনায় আসছিলেন। মিথ্যাচারী নবুয়াতের দাবীদার মোসায়েলামার অনুচরগণ রাস্তা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল মোসায়েলামার কাছে। মোসায়েলামা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল মোসায়েলামা আল্লাহ্র রাসূল তুমি বিশ্বাস কর না? তিনি দৃঢ়তার সাথে এর প্রতিবাদ করেন। মোসায়েলামা তাঁর এক হাত কেঁটে দিল। আবার সে একই প্রশ্ন করলো হাবিব বিন জায়েদের কাছে। সাহসী মায়ের পুত্র মর্দে-মুমিন হাবিব একটুও ভীত হলেন না, নির্ভীক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন আবার। জালিম মোসায়েলামা তার অপর হাতটিও কেটে ফেললো। একে একে মোসায়েলামা তাঁর সব ক'টি অংগ কেটে ফেললো, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী হযরত উম্মে আম্মারার পুত্র প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে সত্যের জন্যে, ইসলামের জন্যে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিলেন আল্লাহর রাস্তায়। মিথ্যা এবং জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সকল যুগের আল্লাহর পথের পথিকদের অন্তরে অমর হয়ে রইলেন।

পুত্রের ওপর এমন নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচারের লোমহর্ষক ঘটনার খবর পেয়েও উম্মে আম্মারা একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয়, আসলে তারা মৃত নয় বরং তাঁরা জিন্দা, তাঁরা শহীদ। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তিনি সরিয়ে দিলেন তাঁর মাতৃ সুলভ দুর্বলতা। তিনি ধৈর্য্য ধারণ করলেন এবং শপথ করলেন যে, যদি মোসায়েলামাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে কোন সৈন্য বাহিনী পাঠানো হয়, তবে তিনি সেই বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন এবং মোসায়েলামাকে হত্যা করে পুত্র শোকের বদলা নেবেন। এ ঘটনার বদলা নেওয়ার জন্যে এবং পয়গম্বরের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামার বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ইয়ামামায় পাঠান হলো। বৃদ্ধা হযরত উম্মে আম্মারাও ঐ সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলেন। প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। বৃদ্ধা হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) শত্রুদের তীর তরবারীর আঘাত উপেক্ষা করে মোসায়লামার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে আক্রমণ করলেন। শত্রুব্যুহ ভেদ করার সময়

শত্রুর তরবাদীর আঘাতে তাঁর একটা বাহু কেটে গেল কিন্তু তিনি তাতে দমলেন না। মোসায়লামার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইতোমধ্যে অন্যদের আঘাতে মোসায়সালামা মৃত্যুবরণ করে। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

তিনি যে একজন সংগ্রামী নারী ছিলেন, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, রাসূলে করিম (সাঃ) -এর উক্তি থেকে। ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন যে, যে দিকে তাকাই সেদিকেই হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) কে যুদ্ধ করতে দেখি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নির্ভিকভাবে আল্লাহর পথে চলার জন্যে রাসূল (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

হযরত উম্মে হাকিম ঃ হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) কোরায়েশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মামা ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের খ্যাতিমান বীরযোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)। ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জেহেলের পুত্র আকরামা ছিলেন তাঁর স্বামী। আবু জেহেলের মত আকরামাও ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। স্বামী, স্ত্রী মিলে মদিনায় ইসলামী সমাজ উৎখাত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর স্বামী সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

অসত্য এবং অন্যায় প্রচারে তিনি জীবনের যে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন, তার জন্যে তিনি সব সময় অনুশোচনা করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর স্বামী আকরামা দেশ থেকে পালিয়ে যায়। তিনি তাঁর স্বামীকে ক্ষমা করার জন্যে এবং নিরাপত্তা প্রদানের জন্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলো। তিনি বহু সাধনা করে তাঁর স্বামীকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। ইসলামের সুমহান আদর্শ তাকে বুঝালেন এবং তাকে মুসলমান হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁর অনবরত সত্য প্রচারের ফলে স্বামী আকরামা ইসলাম কবুল করলেন। তখন দু'জন মিলে আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং বিস্তারের কাজে লেগে গেলেন।

হযরত আবু বকরের (রাঃ) শাসনকালে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সৈন্য বাহিনীর সাথে মুসলিম সেনাবাহিনীর এক যুদ্ধ হয় সিরিয়া সীমান্তে। রোম সম্রাট ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারছিলেন না। তার উসকানিতে প্রায়ই আরবীয় গোত্র সমূহ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করত এবং তাদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করত। এতে মুসলমানদের খুব কষ্ট হতো। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) মহাবীর খালিদ বিন সাঈদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিরিয়ায় প্রেরণ

করেন। সাঈদ পুত্র খালিদ যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধ দূরবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হওয়ায় তিনি খলিফার কাছে আরও সৈন্য চেয়ে পাঠান। খলিফা আবু বকর (সাঃ) হযরত আকরামা বিন আবু জেহেলের নেতৃত্বে অতিরিক্ত আরও একদল সৈন্য সিরিয়ায় পাঠান। হযরত উম্মে হাকিমও তার সাথে ছিলেন। হযরত আকরামা যুদ্ধে শহীদ হন এবং এর তিন মাস পর হযরত খালিদ বিন সাঈদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

দামেস্কের উপকণ্ঠে মারজুস সফর নামক স্থানে বাসর করার ইচ্ছা ছিল হযরত খালিদ বিন সাঈদের। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের আশংকা ছিল খুব বেশী। তাই উম্মে হাকিম বললেন, আগে শত্রু হত্যা করুন, তারপর আমাদের বাসর ঘর হবে।

হযরত খালিদ বিন সাঈদ জবাবে বলেন, আমার মনে হয় আগামী কাল যুদ্ধে আমি শহীদ হবো। বিয়ের রসুম শেষ হলো। ওলিমা অনুষ্ঠান থেকে অতিথীরা চলে চাওয়ার আগেই রোমান সৈন্য এসে উপস্থিত হলো। প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত খালিদ বিয়ের পোষাক খুলে রেখে যুদ্ধের মাঠে চলে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধের মাঠ থেকে আর ফিরে আসেন নি। তাঁর অনুমানই সত্য হলো। শত্রুর তরবারীর আঘাতে তিনি শহীদ হন।

হযরত উম্মে হাকিম ভেংগে পড়লেন না বরং ধৈর্য্য ধারণ করলেন। কারণ তাঁর স্বামী আল্লাহর হুকুমে শহীদ হয়েছে। তিনি নববধুর পোষাক পরে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁবুর খুঁটি ভেংগে এ শোকাতুর মহিলা বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেন।

উম্মে হাকিম ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকে বড় করে দেখতেন। তাই তিনি ব্যক্তিগত শোকে ধৈর্য্যহারা না হয়ে আল্লাহর পথে ইসলামী সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সাহস, সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক স্বার্থের জন্যে ব্যক্তি স্বার্থের কোরবানী প্রত্যেক আদর্শবাদী মহিলার অনুকরণ যোগ্য।

বর্তমান যুগেঃ আমরা এতোক্ষণ পর্যন্ত মুসা (আঃ), হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগের ইসলামী আন্দোলনের কিছু সংগ্রামী মহিলার ভূমিকা আলোচনা করেছি। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন চলছে এবং চলবে। বর্তমান দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যে আন্দোলন চলছে সেখানেও মহিলাদের অবদান কম নয়। আজও ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে বহু সংগ্রামী মহিলা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিচ্ছেন, সহ্য করছেন অমানুষিক অত্যাচার। তাদের দু'একজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে তুলে ধরলাম।

জয়নাব আল গাজালীঃ আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে মিশরে কাজ করছে বিপ্লবী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমীন। মিশরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে মহিলারাও অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত ইসলামী মহিলা সংস্থার সভানেত্রী হচ্ছেন জীনত আল গাজালী আল জবাইলী ওরফে জীনত আল গাজালী। তিনি জয়নাব আল গাজালী নামে পরিচিত। জয়নাব আল গাজালী একজন সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ধৈর্য্যশীলা ও সংগ্রামী মহিলা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দলে দলে মহিলারা তার পরিচালিত ইসলামী সংগঠন ইসলামী মহিলা সংস্থায় যোগদান করছেন।

মিশরে এবং সারা বিশ্বে তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব পড়ে। ইখওয়ানুল মুসলেমীন এবং মিশরের যুব ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে জয়নাব আল গাজালীর সাথে পরামর্শ করতেন।

ফেরাউন যেমন মুসা (আঃ)-কে বরদাস্ত করতে পারেনি, সেই রকম ফেরাউনের বংশের দাবীদার মিশরের প্রেসিডেন্ট জালেম জামাল নাসেরও ইখওয়ানুল মুসলেমীনের একামাতে দ্বীনের আন্দোলনকে বরদাশত করতে পারেনি।

অত্যাচারী শাসক ইসলামের দুশমন জামাল নাসের মিশর থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করলো। ইখওয়ান নেতাদের ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলালো। এতেও সে ক্ষান্ত হলো না। পরে আবার ষড়যন্ত্র করলো। এবার শত শত নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করলো। এদের মধ্যে এক সংগ্রামী মহিলা নেত্রী জয়নাব আল গাজালীও ছিলেন। কারাগারে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য তারা হননি, তাঁকে মন্ত্রীত্বের লোভও দেখান হয়, বহু অর্থ সম্পদের লোভ দেখান হয়, কিন্তু তাতেও তিনি একটা সত্য বলা থেকে বিরত হননি, ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ ঈমানের পরিচয় দিলেন এই মহীয়সী মহিলা। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়, কিন্তু তাতেও তিনি বিচলিত হননি।

জয়নাব আল গাজালী যখন জেলে, তখন নসরের লোকেরা বাইরে তাঁর স্বামীকেও অত্যাচার করে এবং জোর করে একখানা তালাক নামায় তাঁর স্বামীর স্বাক্ষর নেয়, কিন্তু তাঁর স্বামী স্পষ্ট করে বলেন যে, আল্লাহ স্বাক্ষী রয়েছেন আমি আমার স্ত্রী জয়নাব আল গাজালীকে কোন ভাবেই তালাক দেইনি। আমি বুড়ো হয়েছি এবং মৃত্যু নিকটবর্তী, আমার জীবনের এ শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত জয়নাব আমার স্ত্রী থাকবে। হয়েছেও তাই। সংগ্রামী মহিলা জয়নাব আল গাজালী

কারান্তরালে থাকতে দুঃশ্চিন্তায় এবং মানষিক পীড়ায় তাঁর স্বামী ইনতেকাল করেন।

জয়নাব আল গাজালীর স্বামীও একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক থেকেও ঈমানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মজবুত।

সকল প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন তাঁকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারলো না। তখন তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি দেয়ার সময় মুক্তিদানকারী অফিসারকে তিনি বলেন, ইসলামী শাসন ও সরকার কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানাদের ওপর ফরজ, অর্থাৎ সামষ্টিক দায়িত্ব। এর প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান জানাতে হবে। যেভাবে প্রিয় নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মানুষকে ডেকে ছিলেন, এটা প্রত্যেক মুসলমানের সাধারণ দায়িত্ব। এতে ইখওয়ানি বা অইখওয়ানির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মরিয়ম জামিলাঃ বর্তমান যুগের আরও একজন ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী বেগম মরিয়াম জামিলা। তিনি আমেরিকার এক সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল মার্গারেট মার্কিউস। বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তাশীলা ও ধর্ম পরায়ন ছিলেন এবং সত্যের সন্ধান করতে থাকেন। ১০ বছর বয়সে তিনি যখন ইহুদীদের রবিবাসরীয় স্কুলের ছাত্রী তখন ইসলামকে জানার প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ঐ সময় তাদের পাঠ্য পুস্তক থেকে তিনি জানতে পারেন যে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ইহুদী এবং আরবদের পিতা। আরও জানেন যে এক সময় ইউরোপের খৃষ্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়লে স্পেনের মুসলমানরা ইহুদীদেরকে আশ্রয় দেয়। তিনি তখন মনে করেন যে, আরব ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যেই ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ফিরে যাচ্ছে। ছাত্র জীবনে ধর্ম সম্পর্কে যা পড়ান হতো তার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামসহ সকল ধর্মের ওপরে ইহুদী ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। ইহুদীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো তার কাছে মোটেই ভাল লাগতো না। আর এই ছাত্র জীবনেই ইসলাম ধর্ম জানার জন্যে তিনি চেষ্টা শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসের এক সকালে অধ্যাপক Katsh এর বক্তৃতা শুনে তিনি কোরআন হাদীসের সাথে বাইবেলের শিক্ষার তুলনা করেন এবং ইহুদী ধর্মের গলদ বুঝতে পারেন। এ সময় তিনি মুসলমান হওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে নানাভাবে বাধা আসতে লাগলো। তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তার পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন সব ছাড়তে হবে এবং অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাকে পড়তে হতে পারে। কিন্তু ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস তাঁকে সব বাঁধা অতিক্রম করে ইসলাম

গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করলো। ১৯৫৭-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তাকে একটা হাসপাতালে অন্তরীণ রাখা হয়, হাসপাতাল থেকে মুক্তির পর তিনি নিউইয়র্ক শহরে চলে আসেন এবং কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা পন্ডিতের সংগে পরিচিত হন। এখান থেকে তিনি বিভিন্ন দেশের মুসলিম আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন। তিনি তখন থেকে ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপরে পত্র পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি মওলানা মওদূদী (রঃ) এর সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ১৯৬০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে তিনি মাওলানার কাছে প্রথম চিঠি লেখেন। তখন তার বয়স ২৬ বছর। মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর সাথে পত্রালাপ এবং মাওলানার বিভিন্ন বই পড়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন।

কন্যাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হতে বিরত করতে না পেরে, মরিয়াম জামিলার ইহুদী পিতা-মাতা ধর্মান্তরে সম্মতি দিলেন এবং মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর সাথে তার পিতা মার্কিউস পত্রালাপ করে মরিয়াম জামিলার ইচ্ছামত লাহোরে চলে আসতে অনুমতি দিলেন। মরিয়াম জামিলা লাহোরে চলে আসেন এবং ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত সুসাহিত্যিক, জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিনী সংগ্রামী মহিলা। তিনি ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে বিপুল তথ্য সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যা বর্তমানে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের পুরুষ এবং মহিলা কর্মীদেরকে সত্যের পথে চলতে সহযোগীতা যোগাচ্ছে।

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা

শান্তি ও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ তারই নাম হচ্ছে ইসলামী সমাজ। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা মানুষের শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং সকল মানুষের সমন্বিত জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এটা বিস্তৃত।

সমাজে শুধু পুরুষই বাস করেনা। সমাজে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তাই নারীকে বাদ দিয়ে শান্তি ও কল্যাণের সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামী সমাজ গঠন করতে হলে নারীকেও সক্রিয় ভাবে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় দেখেছি ইসলামী সমাজ গঠনে নারীরা কেমন সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছেন।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্য থাকে। তা শুরু হয় তার ব্যক্তি জীবন থেকে, পরে পর্যায়ক্রমে আসে তার পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন। নারীদের জীবনেও এ পর্যায়গুলো অবশ্যই থাকে।

নারীর ব্যক্তিগত জীবনে প্রথম কাজ হলো নিজেকে তৈরী করা। এ কাজ শুরু হয় যখন সে বুঝতে শিখে তখন থেকে।

এ সময় থেকে ঠিক করতে হবে তার জীবনের উদ্দেশ্য কি। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে মানুষ চলতে পারেনা। আর সে উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে গড়ে উঠতে হবে সেভাবে। তার উদ্দেশ্য যদি শুধু হয় ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি, তাহলে তার কাজ হবে অন্য রকম। যারা দুনিয়ায় শুধু শান্তি চায় তারা অর্থ উপার্জনে হারাম হালাল বিচার করে না। চলাফেরায় বেশভুষায় চাকচিক্যই কামনা করে এবং যারা ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি চায় তারা ইহকাল এবং পরকালের যিনি মালিক তাঁর বিধিনিষেধ মেনে আয় রোজগার করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই কাজ করে। সে বিশ্বাস করে জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। ফলে আল্লাহর হুকুম মত জীবনকে পরিচালিত করতে পারলেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন শান্তি লাভ করা সম্ভব।

আমরা যেহেতু মুসলমান বলে দাবী করি এবং আল্লাহকে মালিক প্রভু হিসেবে মানি তাই আমাদের প্রথম কাজ আল্লাহর হুকুম আহকামকে জানা। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাব্বুল আলামিন তাঁর কোরআন পাকে বলেছেনঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥

"নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যেই উৎসর্গিকৃত।" এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের নিজেদেরকে গড়তে হবে। নিজেকে ঠিকমত গঠন না করতে পারলে অন্যকে সে সম্পর্কে কিছু করতে বলা যায় না। এ সম্পর্কে আর্থার গুইটার বলেন, "যে নিজেই নিজের সংশোধন করে সেই পরবর্তী সময়ে অন্যের শিক্ষক হতে পারে।" তাই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমাজে চালু করতে হলে নিজেকে আগে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে কাজের পদ্ধতিকে আমরা তিন পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্যায় ঃ

প্রথম জীবনে নারী থাকে অবিবাহিত। ঘর সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত। একজন প্রাণচঞ্চলা কিশোরী, আগামী দিনের একজন গৃহকর্ত্রী সুসন্তানের মা। ইসলামী আন্দোলনের একজন সংগ্রামী মহিলা কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার এটাই একটি উত্তম সময়। এ সময় যে অবহেলা করে সময় নষ্ট করে তার ভবিষ্যত জীবন হয় অন্ধকার।

এসময় মেয়েরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তখন তার করণীয় কাজ হবে নিম্নরূপঃ

যেহেতু এ সময়টা আপনার নিজেকে তৈরী করার সময়, সেহেতু এ সময়ে আপনার ক্লাসের পড়ার ফাঁকে কোরআন হাদীস বুঝে বুঝে পড়ার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামের ছাঁচে নিজের চরিত্র গঠন করতে হবে, পারিবারিক পরিবেশে যদি কোরআন হাদীস বুঝে পড়ার ভাল ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিজের থেকেই আপনাকে কোরআন হাদীস বুঝে পড়তে হবে। কোরআন হাদীস বুঝে পড়ার মাধ্যমেই আপনি জানতে পারবেন আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় আপনার দায়িত্ব কি এবং সে দায়িত্ব আপনি কিভাবে পালন করবেন? মানুষের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে কোরআন হচ্ছে অমূল্য মহাগ্রন্থ এবং হাদীস হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। এ দু'টো গ্রন্থ অর্থসহ বুঝতে না পারলে ইসলামকে কোন রকমেই বোঝা যাবে না, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হওয়া তো দূরের কথা। কোরআন এবং হাদীসের সাথে সাথে আপনাকে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের

মাধ্যমে নিজের জীবন জিজ্ঞাসা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে এবং জানা যাবে ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন বিধান যা চির আধুনিক এবং চির প্রগতিশীল। মানুষের জীবনে শান্তি নিরাপত্তা কল্যাণ একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। নারী জাতির মুক্তি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও পূর্ণ অধিকার দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা বা মানুষের মনগড়া কোন মতবাদ যে নারী জাতির কোন মুক্তি বা কল্যাণ দিতে পারে না তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকটা নারীর অপরিহার্য্য কর্তব্য আর এ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব একমাত্র ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে। এছাড়াও সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে ইসলামের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এসব ব্যাপারে আপনাকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ছাত্রী হিসেবে আপনি হয়ত ভাববেন নিজের ক্লাসের পড়াশুনা করে আর ইসলামী সাহিত্য পড়ার সময় কোথায়? তাহলে তো সারাদিন আমাকে এসব বই নিয়ে বসে থাকতে হবে। না, তার কোন দরকার নেই। কিন্তু আপনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, দুনিয়ার পরীক্ষায় পাশের জন্যে আপনি যদি দিনের মধ্যে ১০/১২ ঘন্টা পড়াশুনা করতে পারেন, তবে কি আখেরাতের পরীক্ষায় পাশের জন্যে এবং ইসলামী আন্দোলনে একজন কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যে দিনে ২/১ ঘন্টা সময় দেয়া প্রয়োজন নয়? আমি মনে করি, ইসলামকে জানার জন্যে দিনে নিয়মিত ভাবে ২/১ ঘন্টা সময় ব্যয় করলেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যাবে ইনশাল্লাহ। এ বয়সে অনেক মেয়েরা বাজে গল্প, উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করে থাকে। বাজে বই পড়ার ফলে পাঠ্যপুস্তকে মনও বসে না। কিন্ত আপনারা সে সময় কোরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়তে পারেন এবং এতে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

বই পড়ার ফলে চিন্তার পরিশুদ্ধির সাথে সাথে স্মরণশক্তিও বৃদ্ধি পাবে। ক্লাসের পড়াশুনা মনেও থাকবে। সর্বোপরি আল্লাহর কালাম পড়ায় ও ইসলামী জ্ঞান লাভের ফলে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য আসবে।

কোরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে ইসলামী আদর্শের যে জ্ঞান আপনি অর্জন করলেন, যে জ্ঞান আপনার জীবনে আনলো এ পরিবর্তন, দিল অনাবীল শান্তি সে পথে নিজের পিতামাতা, ভাইবোনকেও আনার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে।

আপনার যে সব ভাইবোন স্কুলে, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আদর্শ বুঝানো এবং ইসলামী আন্দোলনের পথে অগ্রসর করে তোলা আপনার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদের

সামনে আপনাকে নৈতিক চরিত্রের এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে দাঁড়াতে হবে। ইসলামের বিধি বিধান ফরজ, ওয়াজেব, হারাম, হালাল সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। আপনি যদি শরিয়তের বিধান মোতাবেক পর্দা না করেন অথবা ফজরের নামাজ আপনার কাজা হতে থাকে তাহলে আপনি আপনার ভাই-বোনকে শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য করতে পারবেন না। আপনার কথাবার্তা চলাফেরা সব কিছুর মধ্যে দিয়েই ভাই বোনের কাছে আপনাকে হতে হবে আদর্শ। যদি আন্তরিকতার সাথে, হেকমতের সাথে তাদের পিছনে কাজ করতে পারেন, তবেই বর্তমানের পংকিল এবং নোংরা আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে আপনি আপনার ভাই বোনদেরকে একজন খাঁটি সচ্চরিত্রবান মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

আপনি একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। যদি আপনার পিতামাতা এখনো এ পথের আলো না পেয়ে থাকেন তবে আপনার দায়িত্ব হবে তাদেরকে এ পথে আনা। এটা একটা কঠিন কাজ, কারণ পিতামাতা হচ্ছেন আপনার মুরুব্বী, তাদেরকে আপনার শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের সাথে বেয়াদবি করা চলবেনা, তাদেরকে আপনি আদেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকতে হবে। যদি কখনও আপনি দেখেন যে তারা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করছেন, তাহলে হেকমতের সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে বুঝাতে হবে। যদি দেখেন যে তাতেও কোন কাজ হচ্ছে না, বরং বিপরীত ফল হচ্ছে, তাহলে তখন চুপ করে থাকতে হবে এবং পরে মন-মানসিকতা বুঝে তাদেরকে বুঝাতে হবে। আপনার বলার পরও যদি তারা সংশোধন না হন, তবুও তাদের সাথে বেয়াদবি করা যাবে না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আল্লাহর হুকুম আহকামের পরিপন্থী তাদের কোন হুকুম মানা চলবে না।

সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েরা যখন বিবাহযোগ্য হয় তখন পিতামাতা তাদেরকে তাদের মনোনীত পাত্রের সামনে নানা অজুহাতে পাঠানোর জন্যে চেষ্টা করেন। এভাবে ইসলামের পর্দা প্রথার খেলাফ করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে পিতা-মাতার এহেন অনৈসলামী কাজে সহযোগিতা না করাও আপনার কর্তব্য। কারণ আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে আর কারও আনুগত্য করা যাবে না।

ইসলামী আন্দোলনের পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এরপরে আসে আপনার আত্মীয়-স্বজন, বান্ধবী সহপাঠিনী। এদের সাথেও আপনাকে এরূপ ব্যবহার করতে হবে যেন আপনি তাদের আদর্শ হতে পারেন। তাদের সামনে আপনাকে আপনার নৈতিক চরিত্র তুলে ধরতে হবে।

আপনি যে সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন তাদেরকেও সেই সত্যের দাওয়াত দিতে হবে। এদের কাছে দাওয়াত পৌঁছান আপনার নৈতিক দায়িত্ব। মৌখিক দাওয়াত তো দিতেই হবে, কিন্তু ফলপ্রসু হবে, যদি আপনি সত্যের সাক্ষ্য হতে পারেন। আপনার কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার, চলাফেরার মধ্যে যদি ইসলামী আদর্শের যথার্থ প্রতিফলন ঘটে তবেই তারা উৎসাহিত হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

এ জীবনে আপনি নববধু, সদ্য বিবাহিতা। পিতা-মাতার আদর ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসার পরিবেশ ত্যাগ করে আপনি এসেছেন নতুন এক জায়গায়, নতুন এক পরিবেশ, পিতা-মাতার স্থানে পেয়েছেন শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাই বোনের স্থানে পেয়েছেন দেবর-ননদ। ইসলামী আন্দোলনের কাজে কোন পরিধি নেই। কর্মী যেখানে যাবে সেখানেই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেবে। এ পর্যায়ে আপনার কাজ শ্বশুর-শাশুড়ী ও দেবর-ননদকে সত্যের পথ দেখান।

শ্বশুর বাড়ীতে আপনি এক নতুন পরিবেশে নূতন মানুষ। নূতন বউ বাড়ীতে আসলে যেমন সকলে উৎসুক চোখে তার খুটি-নাটি দেখতে থাকে তেমনি আপনার আচার ব্যবহার, চাল-চলন, কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা কোনটাই সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় না। এমতাবস্থায় আপনাকে আপনার শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সামনে উন্নত চরিত্রের নমুনা পেশ করতে হবে।

এখানে সর্ব প্রথম কাজ করতে হবে আপনার স্বামীর ওপর। আপনার স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা, শিক্ষা ও উন্নত চরিত্র দিয়ে তার হৃদয় জয় করতে হবে। তার সুখে-দুঃখে সমভাগী হওয়া আপনার যেমন কর্তব্য তেমনি তাকে আল্লাহ রাসূলের পথে পরিচালনা করাও আপনার দায়িত্ব। সৌভাগ্যবশতঃ আপনার স্বামী যদি আগে থেকেই এ পথের অনুসারী হন তবে তাকে তার এ পথে আরও দৃঢ়ভাবে থাকার জন্যে উৎসাহ যোগান ও প্রেরণা দেওয়া আপনার কাজ। দুঃখের সাথে হলেও আমাকে বলতে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী বেচারা বড় ভাল মানুষ, বিয়ের আগে কোন আড্ডা দেয়া বা তাস পাশা কিছু খেলতেন না, হারাম রোজগার করতেন না, পর্দা করে চলতেন কিন্তু বিয়ের পরে স্ত্রীর সাহচর্যে এসে উল্টো পথে চলতে বাধ্য হন। স্ত্রীর খিটমিটে মেজাজ। তাই বাড়ীতে স্বামীর মন বসেনা। ফলে আড্ডা দেয়, তাস পাশা খেলে সময় কাটায়। স্বামীকে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে যেয়ে হারাম পথে রোজগার করতে হয়। অনেক সময় স্ত্রী চায় তার স্বামী তার বোন ও বান্ধবীদের সাথে কথা বলুক, রসিকতা করুক নতুবা লোকে ঘর কুনো বলবে। তাই পর্দা লংঘন করতে হয় তাকে। আবার একজন সৎ দ্বীনদার স্ত্রীর সাহচর্যে এসে অসৎ, চরিত্রহীন স্বামীও সৎ, চরিত্রবান মানুষে

পরিণত হয়ে থাকে। স্ত্রী জানে তার স্বামী কত টাকা বেতন পান। হয়তো সামান্য টাকা বেতনের একজন সরকারী চাকুরে। কি করে সংসারে এতটাকা খরচ করেন? মাসে মাসে শাড়ী গয়না কিনেন। একটু চিন্তা করলে স্ত্রী খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন যে স্বামীর এ টাকা সৎ পথে অর্জিত নয়। স্ত্রী যদি বলে, তোমার অসৎ পথে অর্জিত টাকা আমি চাই না, অসৎ পথে অর্জিত টাকার শাড়ী গয়না আমি চাই না। তুমি সৎপথে যে টাকা উপার্জন করবে তাই দিয়ে আমাদের সংসার চলবে, তা হলে স্বামী নিশ্চয়ই খুশী হবেন। কারণ আপনার স্বামী জানেন অসৎ পথে উপার্জন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। সুতরাং তিনিও চাইবেন সৎপথে উপার্জন করতে। অনুরূপভাবে একজন স্ত্রী পারে তার সৎ স্বামীকে অসৎ পথে পরিচালিত করতে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী অল্প আয়ের একজন চাকুরীজীবি। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর আয়ের দিকে নজর না দিয়ে বোনের বিয়ে বা কারো জন্মদিনে দামীদামী উপহার দেয়ার জন্য বায়না ধরে। দামী উপহার দিয়ে অন্য ধনী-আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের সাথে উপহারের প্রতিযোগিতা করতে চায়। স্ত্রী বলে, দামী উপহার দিতে না পারলে আমি অনুষ্ঠানে যাব না। কম দামের উপহার দিয়ে মান খোয়াতে পারবো না। স্ত্রীর জেদ পূরণ করতে, তার মান সম্মান রক্ষা করতে স্বামী বেচারাকে অসৎ পথে রোজগার করতে বাধ্য হতে হয়।

স্বামী ইসলামী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, আন্দোলনের কাজের প্রয়োজনে যখন রাত্রে বাসায় আসতে বিলম্ব করেন অথবা সংসারে ঠিকমত বাজার করতে পারেন না এবং প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সময়ও দিতে পারেন না, তখন সংসারে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন ছেলে মেয়ের পড়া শুনার অসুবিধা, ঘরে প্রয়োজনীয় খাদ্য না থাকা ইত্যাদি। এ সময় এ সমস্যার সমাধান করতে স্ত্রী বাস্তবভাবে এগিয়ে আসতে পারেন, আবার সাহায্য সহযোগীতা না করে তার পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে তাকে আন্দোলনের কাজে পিছিয়েও দিতে পারেন।

স্বামীর পরে আপনার কাজ করতে হবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, তারা আপনার মুরুব্বী। পিতা-মাতার মত তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের মনে কষ্ট লাগতে পারে এমন কোনরকম কাজ করা চলবে না। যদি তারা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন না বুঝেন তবে তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে ভালভাবে বুঝাতে হবে। আপনার সুন্দর আচার ব্যবহার ও কথা বার্তার মাধ্যমে তাদের মন জয় করতে হবে। তাদের সামনে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াতে হবে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে বুঝানোর ব্যাপারে স্বামীর সাথে পরামর্শ করতে হবে। তার সাহায্য নিতে হবে এবং হেকমত সহকারে কাজ করতে হবে। তবে শ্বশুর-শাশুড়ী যদি ইসলামী আন্দোলনের অনুকুলে হন তাহলে

তো কোন কথাই নেই। যদি তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হন তবে তাদের কাজে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করতে হবে।

এরপর আপনার নজর দিতে হবে আপনার দেবর ও ননদের দিকে। তাদের সাথে আপনার নিজের ভাই-বোনের মত ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে হবে। তাদের সামনেও আপনার উন্নত চরিত্র পেশ করতে হবে। অতীতে যেভাবে আপনি আপনার উত্তম আদর্শ, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা দিয়ে আপনার ভাই-বোনদের কাছে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে এদের আপনি কোরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিতে পারেন, কিন্তু দেবরদের ব্যাপারে আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধানকে সঠিকভাবে মেনে কাজ করতে হবে। কোন প্রকারে শরীয়তের সীমালংঘন করা যাবে না। এদেরকে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সহযোগীতা নিয়ে যদি ইসলামী আন্দোলনের পথে অগ্রসর করতে পারেন, তবে এটাই হবে আপনার জীবনের বিরাট সাফল্য।

তৃতীয় পর্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় পেরিয়ে এবার আপনি সংসারের একজন পরিপূর্ণ গৃহকর্ত্রী। আপনি এখন সন্তানের মা, আপনার দায়িত্ব এখন অনেক বেশী। এবার আপনার কাজ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এখন আপনাকে তৈরী করতে হবে আপনার সন্তানদেরকে, এ সন্তানরাই হবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আপনি, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং যোগ্য নেতা তৈরীর কারীগর। কে বলতে পারে আপনার আজকের শিশুই আগামী দিনের প্রেসিডেন্ট বা প্রধান মন্ত্রী নয়।

Family is the primary educational institute of Children. অর্থাৎ পরিবারই হচ্ছে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। শিশুদের ওপরে তার মা যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, ততখানি প্রভাব বিস্তার আর কেউ করতে পারে না। কারণ শিশু তার মাকেই বেশী অনুকরণ করতে ভালবাসে। সে সব সময় মাকে কাছে পায়। মা তার আদর স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে একটি শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

মা-ই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন। শিশুর মন থাকে সরল এবং কাদার মত নরম। এ মনকে মা তার ইচ্ছামত তৈরী করতে পারেন। আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে মাকে হতে হয় শিশুর সামনে সত্যের প্রতীক। মা-ই পারে তার সন্তানকে সুন্দর, সত্যবাদী, সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে। আবার সেই মা-ই পারে তার সন্তানকে অসৎ দুঃশ্চরিত্র,

সমাজ বিরোধী হিসেবে গড়ে তুলতে। নেপোলিয়ান বলেছিলেন,"আমাকে শিক্ষিতা মা দাও, আমি উত্তম জাতি উপহার দেবো।"

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বলেছেন, "খাদীজা (রাঃ) একজন উত্তম মাতা ছিলেন।" তাই শিশু যাতে সুন্দর, চরিত্রবান, সৎনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে প্রতিটি মায়ের খেয়াল রাখতে হবে। শিশুকে ছোট বেলা থেকেই কোরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য পড়াতে হবে। মা যখন পড়বেন তখন তাকে পাশে নিয়ে বসতে পারেন এভাবে তার অবচেতন মনে ইসলামের জ্ঞান জন্মাবে। শিশুকে ছোট বেলা থেকেই নামাজ পড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। নামাজ যে তাকে শুধু ইসলামী আদর্শবাদী হিসেবে গড়ে তুলবে তাই নয় বরং নামাজ শিশুকে ছোটবেলা থেকেই সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। মানুষের জীবনে এ দু'টি বড় গুণ। পৃথিবীতে যিনি যত বেশী সময়ের মূল্য দিতে পেরেছেন তিনিই ততবেশী জীবনে উন্নতি করতে পেরেছেন।

রাতে ঘুমানোর আগে সব শিশুই গল্প শুনতে ভালবাসে। এ সময় তাদের রাক্ষোস– ক্ষাক্কসের আজগুবী গল্প অথবা পাতালপুরীর রাজকন্যা, রাজকুমারের কাল্পনিক গল্প না শুনিয়ে নবী, রাসূলদের ও বড় বড় সচ্চরিত্রবান মনিষীদের জীবনী গল্প আকারে বলা যেতে পারে। কারণ তা হলে তারাও তাদের জীবনে এভাবে একজন আদর্শবান মনিষী হিসেবে গড়ে ওঠতে চেষ্টা করবে। আবার সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের গল্প শুনালে শিশুও নায়ক–নায়িকাদের মত হওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ শিশুর এ অবচেতন মনে আমরা যা এঁকে দেবো সে ঠিক সেই রকম হতে চেষ্টা করবে। একজন কুমার যেমন নরম কাঁদা দিয়ে তার নিজের ইচ্ছে মত জিনিস গড়তে পারে তেমনি একজন মাও শিশুকে যেমন ইচ্ছে তেমনি গড়তে পারেন।

অনেক সময় মাকে দেখা যায় কান্নারত শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এটা এনে দেবো ওটা এনে দেবো বলে মিথ্যা প্রলোভন দেন। আবার কখনও কখনও এ বলে থাকেন কেঁদোনা আব্বা মারবেন, বাইরে বাঘ আছে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে ইত্যাদি। এগুলো শিশুকে মিথ্যা কথা বলতে এবং মিথ্যুক হতে শেখায়। সুতরাং শিশুদের সামনে কখনও মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়। এই শিশুর চরিত্র গঠনে একজন মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী।

প্রতিবেশীর প্রতিও একজন নারীর কর্তব্য রয়েছে। ইসলাম প্রতিবেশীর ওপর হক আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। হাদীস শরীফে আছেঃ "হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ)বলেছেন, জিব্রাইল (আঃ) সব সময়ই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা

হয়েছিল হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির হকদার বানিয়ে দেওয়া হবে।” হয়রত আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যখন তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে দিতে পার।”

প্রতিবেশীর প্রতি এ দায়িত্ব শুধু জিনিসপত্র লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকেও তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তার সুখে–দুঃখে সমভাগী হতে হবে। আপদে-বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন সমস্যায় অকৃত্রিম বন্ধুর মত এগিয়ে আসতে হবে। যেন সে মনে করে যে সত্যি আপনি তার একজন মংগলাকাংখী। এর পর বিভিন্ন সময়ে হেকমতের সাথে তার সামনে ইসলামী আদর্শ তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ একজন কৃষক যেমন মাটি তৈরী করে, তারপর বীজ বপন করে তেমনি আপনাকে প্রথমে প্রতিবেশীর মন বুঝে কাজ করতে হবে। এভাবে কাজ করে যদি একজন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ইসলামী আন্দোলনের পথে আনা যায় তাহলে তিনিও পারবেন তার পরিবারকে এ পথে আনতে। এভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে সকল বাড়ীতে।

সামাজিক জীবন ঃ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নারী-পুরুষ নিয়েই গঠিত হয় সমাজ। তাই সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কারের কাজে নারী-পুরুষ সবাইকেই অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ কোন কাজ একা একা করা সম্ভব নয়। আমরা জানি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই যে কোন কঠিন কাজ করা সম্ভব এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কোন অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বর্তমানে আমাদের সবচাইতে দুর্ভাগ্য যে, আমাদের মা-বোনদের যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বাসী এবং খোদাহীনতার পথের পথিক তারা সবাই সংঘবদ্ধ। তারা বিভিন্ন নামে সমিতি গঠন করে, সভা-সমিতি অনুষ্ঠান করে, নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারী জাগরণের নামে সমাজে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। তারা এতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে যে নারীর অধিকারের নামে ইসলাম প্রদত্ত বিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার আইনসহ ইসলামের বিভিন্ন বিধানের প্রতি কটাক্ষ এবং ইসলামী বিধান পরিবর্তনের দাবী করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। কিন্তু আমরা যারা বিশ্বাস করি যে, মেয়েদের জ্যান্ত করব দেওয়া থেকে ইসলামই উদ্ধার করেছে, মেয়েদের এক গৌরবময় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, মোহরানার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দিয়েছে যা আজও পাশ্চাত্য সভ্যতা বা অন্য কোন ধর্মে মেয়েদের দিতে

পারেনি। তারা সবাই আজ সমাজে একে-অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো আমরা অনেকেই ভাল ভাল কাজ করি, ভাল চিন্তা করি, ভাল বক্তৃতাও করি। চেষ্টাও করি আমাদের সন্তানদের এ খোদাহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার সয়লাব থেকে উদ্ধার করতে কিন্তু আমরা তা পারি না। কারণ আমরা ভাল মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন, সংঘবদ্ধ নই, অন্যদিকে বিপথগামীরা, পাশ্চাত্যবাদীরা সবাই সংঘবদ্ধ, তাদের ঐ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সামনে আমাদের বিচ্ছিন্ন ভাল কাজগুলো ভেসে যাচ্ছে এবং আমরাও ভেসে যাচ্ছি। এ জন্যই অনেকে প্রায় সময় বলে থাকেন, এতো চেষ্টা করেও ছেলে-মেয়েদের ভাল করতে পারলাম না। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি যে দুনিয়ার সকল অন্যায় শক্তিগুলো একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের সন্তানদের বিপদগামী করছে, নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করছে। তখন আমরা বিচ্ছিন্নভাবে তাদের কিভাবে রুখবো। সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের, আপনার-আমার প্রাণপ্রিয় সন্তানদের এ পংকিলতা থেকে উদ্ধার করার জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য।

বর্তমানে খোদার নির্দেশিত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার কাজে তথাকথিত সভ্যতার নামে নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকারের নামে কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যবাদী মহিলা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাদের এ প্রতিবন্ধকতার প্রচেষ্টা নস্যাত করতে না পারলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আপনার আমার ইহকালীন সুখ ও শান্তি সম্ভব নয়, পরকালের মুক্তি তো দূরের কথা। তাই আমরা যারা আল্লাহর এবং রাসূলের (সাঃ) নির্দেশিত ও প্রদর্শিত ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী তাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কারণ উগ্র পাশ্চাত্যবাদীদের উস্কানিতে ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আজকের সমাজকে যে ভাবে কলুষিত করা হচ্ছে তাতে আমার-আপনার ভাই-বোন ও সন্তানরা রেহাই পাবে না। সে কারণে ইসলামী আদর্শের অনুসারী মহিলাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া একা একা এবং বিচ্ছিন্নভাবে আমরা যতই চিন্তা ভাবনা বা হাহুতাশ করিনা কেন এ দূষিত এবং পংকিল সমাজ পরিবর্তন সম্ভব হবে না। আর এ জন্যেই আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

"তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না।" রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন "আমি তোমাদের ৫টি কাজের আদেশ করছি, যে পাঁচটি কাজের বিষয় আল্লাহপাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ (১) জামায়ত বদ্ধ হবে, (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, (৩) নেতার আদেশ মেনে চলবে, (৪) হিজরত করবে ও (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর সমাজে প্রচলিত কথা আছে একতাই শক্তি। আমরা জানি একটা কাঠি দিয়ে কোন দিনও ঘরের ময়লা দূর করা সম্ভব নয়। দশটা কাঠি একত্রে বেঁধে ঝাঁড় দিলে ঘরের ময়লা দূর করা সম্ভব। আগেই বলেছি সমাজ সংস্কার শুধু পুরুষদের কাজ নয়, যেহেতু একটা সুন্দর সুষ্ঠু আদর্শবাদী সমাজ গঠন তথা ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মহিলাদেরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মসূচী নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মহিলাদের জন্যে একটা সুখবর রয়েছে; সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাই অনুসরণ করতে হবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যে কোন সংগঠনকে।

যদি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত কোন সংগঠন থাকে তবে আপনার আমার কর্তব্য অনতিবিলম্বে সে সংগঠনের সঙ্গে যোগ দেয়া। যদি এমন কোন সংগঠন না থাকে তবে নিজ প্রচেষ্টায় সংগঠন কায়েম করা। সংগঠনে যোগ দেয়া এবং সংগঠন কায়েমের পরে আপনার আমার কাজ হবে সমাজের অগণিত মহিলাদেরকে বুঝিয়ে ইসলামের পথে নিয়ে আসা। আর এজন্যে একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের মতো ঐ সকল মা-বোনের চিন্তার ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে এবং তদস্থলে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই যে নারীমুক্তির একমাত্র পথ তা বুঝাতে হবে। তাদের চিন্তার কাছে এ কথা ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, দুনিয়ার প্রদর্শিত সকল পথ ও মতবাদে বাইরের চাকচিক্য যতই থাকুকনা কেন এগুলো সবই প্রকৃত পক্ষে ফাঁকা বুলি মাত্র। এগুলো নারী জাতিকে কোন অধিকারতো দেয়নি বরং আল্লাহর প্রদত্ত অধিকার সমূহ এরা নারীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এভাবে ইসলামের সঠিক রূপ এযুগের আধুনিক শিক্ষিতা নারী সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। এদের মধ্যে থেকে যারা ইসলামী আদর্শের দিকে এগিয়ে আসবেন তাদেরকে সংগঠন ভুক্ত করতে হবে।

এভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার পরে, সংঘবদ্ধ মা-বোনদের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভে সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের যোগ্য মহিলা কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। অন্যকথায় একটা বিপরীত মুখী

সমাজ ব্যবস্থায় বাস করেও একজন মহিলা যাতে খোদার পথে চলতে পারে সেজন্যে তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে।

প্রথমত ঃ শিক্ষিতা মহিলাদের চিন্তার পরিবর্তনের জন্যে ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বই -পুস্তক পড়তে দেয়া যেতে পারে, এক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে, তার মন মানসিকতা তার শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বই নির্বাচন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ এ সকল আগ্রহী মহিলাদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব আলোচনা সভায় এমন সব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে এখন মুসলিম মহিলা এ যুগের সমস্যা বিক্ষুদ্ধ পরিবেশে তার কাছে ইসলামের দাবী কি তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে। তাছাড়া প্রচলিত পথ ও মতাদর্শের তুলনায় ইসলামই যে নারীকে সর্বাধিক মানবাধিকার দিয়েছে তাও যেন তিনি জানতে পারেন। এ বৈঠক নিয়মিত চলতে পারে। মাঝে মাঝে আরও নতুন মহিলাকে নিয়ে চা-চক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ ইসলামী সাহিত্যাদি পাঠ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছে, তার আলোকে এ নতুন সহযোগীদেরকে নিয়ে সমাজ সেবামূলক কাজেও এগিয়ে আসতে হবে। এটা একক এবং সংঘবদ্ধ উভয়ভাবেই করা যেতে পারে। সমাজ সেবা মানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে খুব বড় কাজে অংশ গ্রহণ নয়, এ হচ্ছে নেহায়েত একটা ঘরয়ো ব্যাপার। প্রতিবেশী মহিলার খোঁজ খবর নেয়া তার শারীরিক অসুস্থতার সময় তার বিপদে আপদে সহযোগী হওয়া এগুলো করতে হবে এজন্যে যে, তাদের খবরা খবর রাখা আপনার আমার ঈমানী দায়িত্ব। বিপদে আপদে এতো মহানবী (সাঃ) -এর শিক্ষা। মহানবী (সাঃ) বলেছেন- প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে তোমার ওপর তুমি তা অবশ্যই পূরণ করবে। তিনি আরও বলেছেন- যে কোন লোকের ভাল হওয়া, কিংবা মন্দ হওয়া তার প্রতিবেশীর সাক্ষ্যের ওপরই নির্ভর করে।"

রাজনৈতিক জীবন

এ পর্যায়ে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক মহিলারা রাজনীতির ক্ষেত্রে কি কোন ভূমিকা রাখতে পারে? অন্যকথায় মহিলাদের কি রাজনীতির কোন জীবন আছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন পৃথক পৃথক করে

দেখার উপায় নেই। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম হলে দুনিয়ার মানুষের জীবন সুখের হবে, শান্তি আসবে জীবনে। ইসলাম কায়েম অর্থ অন্য যে কোন মতবাদের পরিবর্তে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া ইসলামের বিধান জারি করা সম্ভব নয়। সুদ আল্লাহ্ হারাম করেছেন কিন্তু আল্লাহ্‌র এ বিধান জারি করার জন্যে রাষ্ট্রের হুকুম প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মহিলাগণ বিভিন্নভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন- প্রচার করে, আন্দোলনের কর্মীদের সাহায্য করে, আন্দোলনে মহিলা কর্মী সৃষ্টি করে, আন্দোলনে স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। নবী (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মহিলারা যুদ্ধে পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর কাজ

ইতোপূর্বের আলোচনায় বলেছি যে, আন্দোলন একা একা করা সম্ভব নয়, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে একটা আদর্শ সংগঠন প্রয়োজন, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সংগঠন গড়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন একজন আদর্শ নেতার, একদল বলিষ্ঠ ও ত্যাগী কর্মী বাহিনী ও বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচী।

কর্মী কাহাকে বলে? যারা কাজ করেন তাদেরকে কর্মী বলে। সাধারণভাবে কর্মীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সক্রিয় কর্মী ও নিস্ক্রিয় কর্মী।

সক্রিয় কর্মী বলতে আমরা বুঝি যারা সব সময় নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। সংগঠনের যে কোন নির্দেশ যথা সম্ভব পালন করেন। নতুন কর্মী তৈরী করেন। অর্থাৎ যাকে নিয়ে সংগঠনের পুরোপুরি কাজ হচ্ছে।

নিস্ক্রিয় কর্মী বলতে বুঝি যিনি অনিয়মিত কাজ করেন, সংগঠনের দায়িত পুরোপুরি পালন করেন না।

কর্মীকে যদিও দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে কিন্তু আমার মতে ইসলামী আন্দোলনে কোন নিস্ক্রিয় কর্মী থাকতে পারে না। কর্মী যিনি হবেন একামতে দ্বীনের দায়িত্ব যিনি বুঝবেন তিনি কখনও নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারেন না।

ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীর প্রথম কাজ হচ্ছে আত্মগঠন। আত্মগঠন অর্থ নিজেকে গড়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে প্রথমে নিজেকে, সমাজকে সর্বোপরি নিজের আদর্শকে জানার মাধ্যমে আদর্শের অনুসারী হওয়া। সত্যিকার অর্থে যদি নিজের আদর্শকে জানা না যায় তবে আর যাই হোক সে আদর্শের অনুসারী হওয়া যায় না। আত্মগঠনের এ কাজ অনেকগুলো উপায়ে করা যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপায় গুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) কোরআন অধ্যয়নঃ আদর্শকে জানার জন্যে ও আদর্শের আলোকে জীবনকে গড়ার জন্যে আল্লাহর কালাম আল-কোরআন অধ্যয়ন মৌলিক কাজ। আল-কোরআন বুঝে শুনে পড়া ও এর মর্ম উপলব্ধি করা ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। আল-কোরআনেই আল্লাহ পাক এ দুনিয়ার জীবনে মানুষের কাজ, মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সমস্যাবলী ও এর সমাধানের পদ্ধতি মানবজীবনের পরিণতি সকল বিষয়ে সম্পূণ ও নির্ভুলভাবে পেশ করেছেন। তাই কোরআন বুঝে পড়া অপরিহার্য্য। কোরআন

বুঝে পড়ার মাধ্যমে খোদার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ কি তা জানা যায়। তাই প্রতিদিন ইসলামী আন্দোলনের মহিলাকর্মীকে অন্ততঃ পাঁচ আয়াত হলেও কোরআন শরীফ বুঝে পড়তে হবে। এ কোরআন অধ্যয়ন সম্পর্কে রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন মনের মাঝেও কালিমার স্পর্শ লাগে, পানির স্পর্শে যেমন লোহায় মরিচা ধরে জিজ্ঞেস করা হলো মনের কালিমা দূর করার উপায় কি? জবাবে রাসূল (সাঃ) বললেন মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ ও কোরআন অধ্যয়ন কর।

(২) হাদীস অধ্যয়ন ঃ কোরআন শরীফ পড়ার পাশাপাশি হাদীস পড়তে হবে। কোরআন হচ্ছে গাইড লাইন আর হাদীস হচ্ছে মূলতঃ আল-কোরআনের ব্যাখ্যা। হাদীস হচ্ছে রাসূলের (সাঃ) বাস্তব জীবনী। তিনি কোরআনের আইনকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত করে এই আইনের সার্থকরুপ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতি ছিল নির্ভুল। সে পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই হাদীস পড়তে হবে। রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথে চললেই তাঁর সত্যিকার অনুসারী হওয়া যায়। আর রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ করাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব পছন্দ করেন। যেহেতু রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথই হবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র আদর্শ পথ তাই আত্মগঠনের জন্যে কর্মীকে অবশ্যই বুঝে শুনে হাদীস পড়তে হবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত হাদীস পড়া একজন কর্মীর জন্যে অপরিহার্য্য।

(৩) ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নঃ আত্মগঠনের জন্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। তাই কর্মীকে অবশ্যই বিভিন্ন মতবাদের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে কোরআন হাদীসের পরে নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। বর্তমান বাজারে বহু ইসলামী সাহিত্য রয়েছে। এ সব বইতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো পড়লে কর্মীর দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে কর্মীকে প্রেরণা যোগাবে।

(৪) নামাজ ঃ নামাজ একজন মোমেনের মিরাজ স্বরূপ। নামাজ পাপ-পংকিলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের প্রধান বাস্তব নমুনা হচ্ছে নামাজ। নামাজ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। একজন খাঁটি মোমিন গতানুগতিভাবে নামাজ আদায় করে না। সে খুষুখুজু বা একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে এমনভাবে নামাজ আদায় করতে হবে যে, নামাজে সে যেন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এ অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং নামাজের মাধ্যমে যেন সকল অন্যায় ভুল ভ্রান্তি দূর হয়ে একদল কর্মী সত্যের সাক্ষ্যে পরিণত হতে পারে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে যথা সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে এবং যদি ওমরী কাজা থাকে তবে ক্রমান্বয়ে তা আদায় করতে হবে। সময় ও সুযোগ মতো রাত্রিতে তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া উচিত।

এহতেসাব

এহতেসাব অর্থ নিজের কাজের সমালোচনা করা। যাকে বলে আত্মসমালোচনা। অন্যের পক্ষে বাহ্যিক দোষক্রুটি সম্পর্কে জানা সম্ভব হলেও ভেতরের দোষক্রুটি জানা সম্ভব নয়। আর এই ভেতরের অর্থাৎ মনের দোষক্রুটি দূর করতে পারলেই মানুষ উন্নত হতে পারে। এ জন্যে প্রত্যেক দিন একটা উপযুক্ত সময় আত্মসমালোচনার জন্যে বেছে নেয়া প্রয়োজন। ঈশা বা ফজরের নামাজের পরে আত্মসমালোচনার জন্যে সময় নির্ধারণ করা দরকার। ভাল কাজের জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং ভুল–ক্রুটির জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। একজন স্বক্রীয় কর্মী এসময় চিন্তা করবেন–সাংগঠনিক কাজে কত সময় ও অর্থ ব্যয় করলেন। দাওয়াতী কাজ ও কর্মী সৃষ্টির ব্যাপারে কতটুকু ভুমিকা রেখেছেন? মানুষের সাথে কেমন উদার, সদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন? কর্মী নিজের কাছে প্রশ্ন করবেন চব্বিশ ঘন্টা যেভাবে ও যে কাজে ব্যয় হলো তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূল (সাঃ) এর সাফায়াত পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট? দ্বীনের দাবী মোতাবেক কি কাজ করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনে রাসূল (সাঃ) -এর আদর্শ কতটুকু পালন করা হয়েছে? শরয়ী পর্দা কি পালিত হয়েছে? পিতামাতা শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর হক আদায় হয়েছে? এভাবে নিখুঁত উপায়ে কর্মী তার ২৪ ঘন্টা কাজের যদি আত্মসমালোচনা করতে পারেন, তবে তার পক্ষে একজন ইসলামী আন্দোলনের মুজাহেদা হওয়া সম্ভব।

আত্মসমালোচনায় মোমিনের জীবন সজীব হয়। কর্মীর কর্ম প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, চরিত্র উন্নত হয়, কাজে আসে বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা ও সর্বোপরি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্যে মন হয় ব্যাকুল।

এরূপ আত্মসমালোচনা প্রত্যেক দিন করা দরকার, আত্মগঠনের জন্যে পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো হলো (Theory) থিওরী আর নিম্নে যে বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করছি তা হচ্ছে (Practical) প্রাকটিক্যাল। কোরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য যতই পড়া হোক না কেন পঠিত জ্ঞানের আলোকে যদি বাস্তবে কোন কাজ না করা হয় তবে আত্মগঠন হতে পারে না। এপর্যায়ে একটা হাদীস স্মরণ করা যেতে পারে। রাসূল পাক (সাঃ) বলেছেন। "একজন মোমিন আর একজন মোমিনের আয়না স্বরূপ। আয়নার সামানে দাঁড়ালে যেমন শরীরের

দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে, তেমনি মোমিনের সাহচর্যে গেলে একজনের দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং তার পরামর্শ মোতাবেক সংশোধন করা যায়। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হতে পারলে অন্য কর্মী বোনের পরামর্শে সংশোধিত হওয়া যায়। আর আন্দোলনের কর্মীর আত্মগঠন তাই নির্ভর করে তার সাংগঠনিক কাজের ওপর। সাংগঠনিক কাজই হচ্ছে আত্মগঠনের বাস্তব বা প্রাকটিক্যাল পদ্ধতি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সাংগঠনিক কাজ নিম্নরুপ ঃ

দাওয়াতী কাজ ঃ ইতোপুর্বের আলোচনায় আমরা বুঝেছি ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা ফরজ। কিন্তু এ কাজ একা একা বসে শুধু নামাজ রোজা বা কোরআন হাদীস পড়লেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এ কাজ একমাত্র সম্ভব হতে পারে কোরআন, হাদীসের জ্ঞান অর্জন এবং এবাদতের মাধ্যমে। ঈমানী মজবুতীর সাথে সাথে অন্যদেরকেও এ কাফেলায় সংযুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। একজন কর্মীর প্রথম কাজ হচ্ছে একদিকে নিজেকে গড়া এবং অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে অন্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সংযুক্ত করার জন্যে নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করা। সর্ব প্রথম পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য থেকে কয়েকজন মৌলিক গুণ সম্পন্ন মহিলাকে খুঁজে বের করতে হবে। এদের সাথে অবসর সময়ে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও গভীর ও মধুর করতে হবে। যদি একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী নুতন জায়গায় যায়, একেবারে নূতন এলাকা, নূতন পরিবেশ, কিন্তু এ অবস্থায়ও সে দাওয়াতী কাজ বন্ধ করতে পারে না। সেখানে তার কাজ হলো এলাকার সকল মহিলাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং এর মধ্য থেকে যারা ধর্মীয় অনুশাসণ মেনে চলে তাদের সাথে পরিকল্পিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা। নূতন এলাকা হোক বা পুরাতন এলাকা হোক দাওয়াতের যোগাযোগের সময় মনে রাখতে হবে, যেন এ ভাব কখনও প্রকাশ না পায় যে আপনি তাদের চেয়ে বেশী জানেন এবং আপনার জানার মধ্যে গব আছে। দাওয়াতের সময় কর্মী কথা বলবে কম এবং অন্যের কাছ থেকে শুনবে বেশী। এ আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যা, তার বুদ্ধিমত্তা, তার দূর্বলতা তার চিন্তাধারা আপনার কাছে ধরা পড়বে। সমস্যায় সহানুভূতি দেখানো এবং সমস্যা দূর করার জন্যে সহযোগিতা করা, বুদ্ধিমত্তা ও ভাল কাজের প্রশংসা করা, চিন্তার গলদ এবং দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্যে একজন কর্মীকে হেকমতের সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তার সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না আপনার কোন কথা বা কাজে সে আঘাত না পায়– সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, তার চিন্তার দুর্বলতা দূর করার জন্যে পরিকল্পিত ভাবে প্রচার পত্র, পুস্তক, পুস্তিকা পড়তে দিতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করানোর চেষ্টা

করতে হবে। মাঝে মাঝে ২/৪ জনকে দাওয়াতী কাজের সুবিধার জন্যে নিজের বাসায় চা-এর দাওয়াত দেয়া যেতে পারে।

এভাবে তারা যেন ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং ইসলাম সম্পর্কে সকল ভুল ধারণা দূর হওয়ার পরে তাকে বুঝাতে হবে অন্য কোন মতবাদ নয়, একমাত্র ইসলামই মানুষকে দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তি দিতে পারে। সেই ইসলাম আপনা-আপনি কায়েম হবে না, এর জন্যে প্রয়োজন আন্দোলন। এর পরে তাকে বুঝাতে হবে ইসলামী আন্দোলন একা একা করা সম্ভব নয়, আর সে কারণেই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) জামায়াত বদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পর্যায়ে তার কাছে রাসূলের (সাঃ) আদর্শে পরিচালিত জামায়াত বা দলের পরিচয় তুলে ধরতে হবে। আপনার দলকে রাসূলের প্রদর্শিত পথে চালিত দল হিসেবে গ্রহণ করলে ও কাজ করতে রাজি হলে তাকে আপনার সহযোগী করে নিতে হবে।

দাওয়াতের এ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তা হচ্ছে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত। আর এক প্রকার দাওয়াত হলো সাধারণ দাওয়াত। চলতে, ফিরতে, বেড়াতে যে কোন মজলিশে বা সভায় যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই সাধারণভাবে মহিলাদের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। অবস্থা বুঝে কথা বলতে হবে। এ দাওয়াতের মাধ্যমেও আপনার দলের সহযোগী করে নিতে পারেন। আবার কয়েকজন কর্মী একসাথে মিশে গ্রুপ করে, সাধারণ ভাবে প্রত্যেকটি বাসায় দাওয়াতের জন্যে গেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যত ভাল কথাই আপনি বলুন না কেন, যদি আপনার ব্যবহার খারাপ হয় তবে দাওয়াত ফলপ্রসু হবে না। তাই কথার চেয়ে উত্তম চরিত্র মহিলাদের সামনে উপস্থাপন করাই দাওয়াতের মূল হাতিয়ার।

কর্মী গঠন

কর্মী গঠন, কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের মজবুতির জন্যে অপরিহার্য্য। নীরব সমর্থকদের দ্বারা ইসলামী আন্দোলনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হলে ইসলামী আন্দোলনের জামায়াতকে একদল বলিষ্ঠ কর্মী বাহিনী গঠন করতে হবে। নতুন কর্মী সৃষ্টি না হলে সংগঠন গতিশীল হয় না। কর্মী হচ্ছে সংগঠনের প্রাণ। নতুন কর্মী যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে বুঝতে হবে সংগঠনে স্থবিরতা এসেছে। শরীরে নতুন রক্ত সৃষ্টি না হলে যেমন রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে, তেমনি দীর্ঘকাল সংগঠনে

নতুন কর্মীর আগমন না ঘটলে সংগঠনের নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ইসলামী আন্দোলনের কাফেলাকে গতিশীল, শক্তিশালী ও বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব নূতন কর্মী গঠন করা। এ জন্যে ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মী তার নিকটবর্তী সহযোগীদের মধ্য থেকে ৩ জনকে কর্মী বানানোর জন্যে নির্দিষ্ট করে নেবেন, এদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তার অভাব-অভিযোগ আপদে বিপদে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের সৎগুণাবলী এবং দুর্বলতা জানতে হবে, গুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্যে পরামর্শ দিতে হবে, পরিকল্পনা মোতাবেক বই পড়তে দিতে হবে এবং মৌলিক এবাদতে উৎসাহিত করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের জামায়াতের প্রোগ্রামে আনার চেষ্টা করতে হবে।

সহযোগী হওয়ার আগে সে যে পরিবেশে ছিল, সেই পরিবেশের এবং সে সময়ের বান্ধবীদের কথা তার মনে হতে পারে, তখন তার মনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ সৃষ্টি হতে পারে। এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব নিরসন করে অন্য মতাদর্শের উর্ধ্বে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তার অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া কর্মীর কাজ। যখন তার পুরান আদর্শ বা বান্ধবীদের কথা মনে হতে থাকে তখন যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তার সঙ্গে বেশী বেশী যোগাযোগ না রাখে তবে সে সহযোগী আবার হারিয়ে যেতে পারে। তাই সহযোগী হওয়ার পর পরই তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা একজন কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন।

মনে রাখবেন ইসলামের বিপরীত পরিবেশের একজন মহিলা যখন আপনার আন্দোলনের সংগঠনের সহযোগী হয়ে যাবে তখন তার পুরান পরিবেশের বান্ধবীরাও তাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করবে। এই সময় যদি আপনার সাহায্য ও বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ না হয় তবে নতুন সহযোগীকে হারাতে হতে পারে। আবার একজন নূতন সহযোগী হঠাৎ করে নব উৎসাহের বসবর্তী হয়ে এমন বেশী বেশী কাজ করল যে আপনার মনে হলো ভাল কর্মী হয়ে গেছে, কিন্তু তার পুরান বান্ধবীদের প্রচেষ্টায় পিছায়ে যেতে পারে। তখন আন্দোলনের কোন কোন কর্মী তার সমাচোলনা করতে শুরু করেন। এতে ঐ নুতন সহযোগীর মনে আঘাত লাগতে পারে এবং পিছিয়ে পড়তে পারে। এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এভাবে ক্রমান্বয়ে তাকে কর্মী পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

কর্মী যোগাযোগ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ সমস্যা সংকুল। সামাজিক পরিবেশ ইসলামের পরিপন্থী। জাহেলিয়াত মানুষকে ঘিরে আছে। ফলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হওয়ার পরে মন টিকে থাকা বা সামনে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রতিনিয়ত জাহেলিয়াতের পরিবেশ কর্মীকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে উপযুক্ত আশ্রয় ও সহায়তা প্রয়োজন। আন্দোলনের কর্মীগণই হচ্ছে একে অপরের আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী। একজন কর্মী অপর কর্মীকে তার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। তার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে, দুর্বলতা বুঝবে এবং তা দূর করার চেষ্টা করবে। এভাবে একজন কর্মী অপর একজন কর্মীকে ঈমানে, আমলে ও কর্ম তৎপরতায় সহযোগিতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর করিয়ে নেবেন এবং তাকে পরিকল্পনার মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

বই বিলি

ইসলামের জ্ঞান লাভ করার জন্যে ইসলামী সাহিত্য একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। দাওয়াত ও চিন্তার পরিশুদ্ধি করানোর কাজে বই বিরাট অবদান রাখতে পারে। বই নিজেই একজন কর্মীর ভূমিকা পালন করতে পারে। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে অথবা কর্মী গঠনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মহিলাকে তাদের মন মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে বই বাছাই করে পড়তে দেওয়া কর্মীর কাজ। তাছাড়া অন্য কর্মীর মানোন্নয়নের জন্যেও বই পড়তে দেয়া যেতে পারে। বই পাঠিকার গুণাবলীর বিকাশ ঘটায় এবং দুর্বলতা দূর করে। তাই বই বাছাই করার পূর্বে নির্দিষ্ট মহিলার গুণাবলী ও দূর্বলতা জানা দরকার। প্রয়োজন বোধে দায়িত্বশীলার সাথে পরামর্শ করে নেয়া যেতে পারে। যে বইটা পড়তে দিতে হবে সে বই সম্পকে নিজের ভাল ধারণা থাকতে হবে। বই বিতরণকারীকে ভাল পাঠিকা হতে হবে।

বৈঠকাদিতে নিয়মিত যাগদান

ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের বিভিন্ন বৈঠকাদিতে সময় মত ও নিয়মিত উপস্থিতি কর্মীর জন্যে অপহিার্য্য বৈঠকাদিতে যোগাদান করলে কর্মীর মানোন্নয়ন হয় কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায় ও সংগঠনের মজবুতির জন্যে বিভিন্ন পরামর্শ ও কর্মকৎপরতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়, বৈঠকে অনুপস্থিত হলে একজন কর্মীর মূল্যবান পরামর্শ থেকে সংগঠন বঞ্চিত হয়, ফলে একামতে দ্বীনের কাজ পিছিয়ে পড়ে। সে কারণে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের বৈঠককে সংগঠনের হৃদপিন্ড স্বরূপ বলা হয়ে থাকে, হৃদপিন্ড

ক্রিয়াশীল থাকলে যেমন শরীরে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে সেইরূপ সংগঠনের নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ের সকল বৈঠকাদি নিয়মিত ও সঠিকভাবে চালু থাকলে সংগঠন সজীব থাকে ও মজবুত হয়। বৈঠকাদিতে হাজির হয় না এবং আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয় না এমন মহিলাকে কর্মী বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

বায়তুল মাল

বায়তুলমালও সংগঠনের প্রাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামী আন্দোলনের বায়তুল মালে সাধ্যমত অর্থদানের মাধ্যমেই সে নির্দেশ পালন করা যায়।

ইসলামী আন্দোলনের কাজে অর্থ প্রদান খরচ নয় বরং আল্লাহকে দেয়া কর্জ। এ এমন এক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ যাতে ক্ষতির কোন আশংকা নেই, লাভের কোন শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা নিজে কর্জ নিতে চাচ্ছেন এবং খুব লাভজনক ব্যবসার দ্বার খুলে দিচ্ছেন। এটা বুঝতে পেরেও যদি আল্লাহর রাস্তায় বেশী করে খরচ করার আগ্রহ সৃষ্টি না হয় তবে তাকে দূর্ভাগ্যই বলতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের বায়তুল মালে দান করা, কোন সাধারণ দান খয়রাতের পর্যায়ভূক্ত নয়। কর্মীদেরকে একথা গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। যদি সামগ্রিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে অন্যান্য ধর্মীয় খেদমতের কেন্দ্রগুলোও বাতিলের সয়লাবে ভেসে যাবে। মজবুত বায়তুল মাল ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের পথে যেসব খরচ হবে, তা কোথা থেকে আসবে, যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায় তারা ছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েমের পথে আর কে খরচ করবে?

বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী বা ভ্রান্ত পথের পথিক কি কোনদিন একামতে দ্বীনের পথে সাহায্য করতে পারে? নিশ্চয়ই না। তাই অতীতে আমরা দেখেছি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী খাদীজা (রাঃ), আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ) প্রমুখ কিভাবে তাদের যথাসর্বস্ব আল্লাহর পথে দান করেছেন এবং আল্লাহর পথে দান করার জন্যে প্রতিযোগিতা করেছেন। আজও ইসলামী আন্দোলন তার কর্মীদেরই দানে গঠিত বায়তুল মাল দ্বারা চলছে। ইসলামী আন্দোলনের বায়তুলমালের মূল উৎস তার কর্মীদের এয়ানত (এককালিন বা মাসিক নির্ধারিত সাহায্য) । তাই সকল কর্মীকে আল্লাহর এ পথে ব্যয়ের আর্থিক

কোরবানীর আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। যে সকল মহিলা কর্মীর নিজস্ব আয় আছে তারা তাদের আয় থেকে এবং যাদের নিজস্ব কোন আয় নেই তারা তাদের প্রাপ্ত হাত খরচ থেকে বাঁচিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বায়তুলমালে মাসিক নিয়মিত সাহায্য দিবেন।

কর্মী শুধু নিজে বায়তুলমাল দিয়ে ক্ষান্ত হলেই চলবে না। পরিচিত বান্ধবী মহল, আত্মীয়-স্বজন, ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও সহানুভূতিশীলদের নিকট থেকেও আদায় করে বায়তুল মালে প্রদান করবেন। এ ধরনের মহিলাদের একটা তালিকাও কর্মী প্রস্তুত করবেন। তাদের সাথে আলাপ করে, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে আখেরাতে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে তা তাদের বুঝাবেন। এ ভাবে একজন নিঃস্ব কর্মীও আল্লাহর দ্বীনের জন্যে অর্থ আদায় করে দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

আন্দোলনের খবর রাখা

ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন শক্তিশালী না হলে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয় আর সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেই সংগঠন শক্তিমালী হয়। কর্মীর কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। কর্মতৎপর কর্মী সব সময়ই সংগঠনের সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন খবরাখবর জানার জন্যে সব সময় উৎসুক থাকে। কর্মীরা যদি এভাবে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তবেই সংগঠন শক্তিশালী হয়। তাই সংগঠনের খবর জানার জন্যে যোগাযোগ রক্ষা করা কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ

প্রত্যেকটি কর্মীর তার উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলাদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত। কারণ দায়িত্বশীলার সাহচর্য কর্মীর মানোন্নয়নের উৎস ও পন্থা। অন্যদিকে একজন দায়িত্বশীলার পক্ষে তার সমস্ত কর্মীদের সাথে সব সময় যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। একজন কর্মী তার নিজের মানোন্নয়ন ও সংগঠনের তাৎক্ষণিক খবরাখবর জানার জন্যে নিয়মিত দায়িত্বশীলার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

দায়িত্বশীলাদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় খেয়াল রাখতে হবে দায়িত্বশীলা বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। তাই পূর্ব থেকে সময় নিয়ে তার যদি কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে তখনই সাক্ষাতের চেষ্টা করা উচিত। ইসলামী

আন্দোলনের কর্মীর যে কাজ ওপরে আলোচনা করা হলো এসব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে হেকমত, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে একজন কর্মীকে। কিতাবী জ্ঞানই কর্মী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হেকমতের সাথে কাজ করা একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর কর্তব্য। তাই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কর্মীকে মূল লক্ষ্যে পৌছার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করে সব সময়ই কর্মতৎপর থাকতে হবে। এটাই ঈমানী দায়িত্ব।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন

যুগে যুগে নবী রাসূলগণ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের যে আন্দোলন করেছেন এবং যে ইসলামী আন্দোলনের চিত্র আলোচনা করেছি, এমন কোন আন্দোলন বাংলাদেশে আছে কি? ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ এবং একাজ জামায়াতবদ্ধ ভাবে করা ছাড়া সম্ভব নয়। একজন মোমিন ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনে যোগদান করা ছাড়া চলতে পারে না। যদি এমন কোন সংগঠন না থাকে তবে, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা তার দায়িত্ব। সে কারণে এখন আমরা দেখবো যে, বাংলাদেশে আল্লাহর নির্দেশিত, রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দাওয়াত কর্মসূচী নিয়ে কোন সংগঠন কাজ করছে কি?

এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো, আল্লাহ্‌র লাখো শোকর যে, আল্লাহর দ্বীন এই দুনিয়ায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) এর তরিকায় একটি সংগঠন কাজ করছে যার নাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার গঠনতন্ত্রে মৌলিক আকিদা হিসেবে কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ জামায়াত বিশ্বাস করে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করা।

এ জামায়াত কোন মানুষের মনগড়া নীতি গ্রহণ করেনি। জামায়াত তার স্থায়ী কর্মসূচী হিসেবে রাসূলের (সাঃ) কর্মনীতিকে গ্রহণ করেছে। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে স্থায়ী কর্মনীতি নিম্নরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। (১) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।

(২) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যে জামায়াতে ইসলামী এমন কোন

উপায় ও পন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও বিশ্বাস পরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

(৩) জামায়াত উহার বাঞ্ছিত সংশোধন ও বিপ্লব কার্যকর করবার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকদের মন-মগজ ও চরিত্রের সংশোধন এবং জামায়াতের অনুকূলে জনমত গঠন করবে। যুগে যুগে নবী–রাসূলগণ যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন তা হলোঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

“হে দেশবাসী একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া আর কোন হুকুমকর্তা নেই।”

শেষ নবীর এ দাওয়াত যারা কবুল করেছেন তারাই বলেছেনঃ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও ঐ কালেমা তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াতকে নিম্নরূপ তিনটি দফায় পেশ করছে।

(১) সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি ও বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করবার আহবান। (২) ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনের সকল কাজে মোনাফেকী ও কর্ম বৈসাদৃশ্য পরিহার করে খাঁটী ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহবান।

(৩) সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্র হতে অসৎ, খোদাদ্রোহী, জালিম ও ফাসিক নেতৃত্ব অপসারিত করে সৎ, খোদাভীরু ন্যায় পরায়ণ ও আল্লাহর নেক বান্দাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহবান।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে কর্মসূচীর মাধ্যমে একদল বলিষ্ঠ, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু লোক তৈরী করে আল্লাহর দ্বীন এ দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করেছিলেন জামায়াতে ইসলামীও সেই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচী নিম্নরুপ ঃ

(১) দাওয়াত ও তাবলীগ

এর মাধ্যমে চিন্তার বিশুদ্ধি করণের কাজঃ

জামায়াত কোরআন-হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরে জনগণের চিন্তার বিকাশ সাধন করছে। তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ ও কায়েম করার চিন্তার বিকাশ সাধন করছে। তাদের মধ্যে ইসলামের অনুসরণ ও কায়েম করার উৎসাহ অনুভূতি জাগ্রত করছে।

(২) তানজিম ও তরবিয়াতের কাজ (সংগঠন ও ট্রেনিং)

জামায়াত ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে ব্যক্তিদেরকে সুসংগঠিত করে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সাধনের যোগ্য করে গড়ে তুলছে।

(৩) ইসলাহে মোয়াশারা (সংস্কার ও সেবামূলক কাজ)

জামায়াত ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের সংশোধন, নৈতিক পূর্ণগঠন ও সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে জামায়াত কর্মী ও জনগণকে ইসলামী সমাজ কায়েমে উদ্বুদ্ধ করছে।

(৪) ইসলাহে হুকুমাত (সরকার সংশোধনের কাজ)

জামায়াত গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শাসণ ব্যবস্থার সকল স্তরে খোদাদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষ, জালেম ও অসৎ নেতৃত্বের বদলে খোদাভীরু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েমের জন্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা চালাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রাসূলে করীমের (সাঃ) পদ্ধতি মোতাবেক আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে পুরুষ ও মহিলাদেরকে সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এ জামায়াতে রয়েছে একদল বলিষ্ঠ, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু পুরুষ কর্মী বাহিনী– যে কোন কোরবানী করতে তারা সদা প্রস্তুত, তেমনি রয়েছে একদল মহিলা কর্মী–তারা মহিলা অংগনে আল্লাহর দ্বীনের কাজ সাধ্যমত করে চলেছেন।

ইসলাম যেহেতু মহিলা ও পুরুষদের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছে, তাই জামায়াতের মহিলা ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। জামায়াতের মহিলা কর্মী

তারা, যারা নিয়মিত জামায়াতের আহবানে সাড়া দেয়, যেমন বৈঠকাদিতে আসে, নিয়মিত আল্লাহর পথে আর্থিক কোরবানী করে অর্থাৎ জামায়াতের বায়তুলমালে এয়ানত দেয়। নিজের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজের হিসেব রাখে যেমন কোরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য পড়ে, দাওয়াতী টার্গেট, কর্মী টার্গেট ও কর্মী যোগাযোগ করে, বই বিলি ও আত্মসমালোচনা প্রভৃতি করে এবং দাওয়াতী কাজ করেন।

আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে একামতে দ্বীনের এই জামায়াতের কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কার্যাদি করার চেষ্টা করছেন।

আসুন, নারী জাতির মুক্তি, কল্যাণ, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত হওয়ার চেষ্টা করি।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। তিনি আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

সমাপ্ত

প্রকাশের পথে ঃ

নারীর অধিকার ঃ

মুসলিম পারিবারিক আইন বনাম ইসলামী আইন

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। জামায়াত প্রকাশনী, ঢাকা

২। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

৩। প্রফেসরর্স বুক কর্ণার, ঢাকা

৪। তাসনিয়া বই বিতান, ঢাকা

৫। সখী বিতান, হেতেম খাঁ, রাজশাহী